অনুগামিনী

বনফুল



বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট: কলিকাতা বারো



প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬৪

প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক : শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬ চালতা বাগান লেন,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী : বিক্রম লাহিড়ী

ব্লক নির্মাতা ও প্রচ্ছদ মুদ্রক :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই :
দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

তিন টাকা

স্বনামখ্যাত কথাশিল্পী

বন্ধুবর শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

ভাগলপুর

২৫-১০-৫৭

ভূমিকা

গত তিন বৎসরে সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যে-সকল গল্প লিখিয়াছিলাম তাহা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া আমার পূর্বগামী গ্রন্থগুলির অনুগমন করিতেছে।

বনফুল

১-১১-৫৭
ভাগলপুর

সূচীপত্র

হীরের টুকরো

অশীতিপর বৃদ্ধ বিমল ডাক্তারের কাছে সেদিন যে রোগীটি আসিয়া হাজির হইলেন তিনিও খুব বৃদ্ধ। যে যুবকটি রোগীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনিই প্রথমে ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ করিলেন।

বলিলেন, "আমার ঠাকুরদাকে একবার দেখতে হবে ডাক্তারবাবু। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি—"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। অনেকদিন থেকেই ওঁর মাথা খারাপ। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই আপনার কাছে এনেছি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?"

"কোলকাতা থেকে।"

"কোলকাতা থেকে ? সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, তাঁদের ছেড়ে আপনি পাড়াগাঁয়ে আমার কাছে এসেছেন, আশ্চর্য তো !"

যুবক একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আসল কারণটা ব্যক্ত করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। ডাক্তারের গুণের জন্য নয় 'বিমল' এই নামটার জন্যই যে তিনি ঠাকুরদাকে তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন একথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

অথচ যে ডাক্তারের নাম 'বিমল' নয় তাহার কাছে ঠাকুরদা কিছুতেই যাইতে চান না। প্রথমেই গিয়া জিজ্ঞাসা করেন 'আপনার নামটি কি'। নাম বিমল না হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসেন। মানসিক ব্যাধিতে যশস্বী দুই একজন ডাক্তারের সহিত তিনি ষড়যন্ত্রও করিয়াছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নাম 'বিমল', রোগীর হিতার্থে তাঁহারা মিথ্যা-ভাষণ করিতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু কোন ফল হইল না। ঠাকুরদা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াই উঠিয়া আসিলেন, তাঁহাদের ঔষধ স্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না। একজন জোর করিয়া একটা ইনজেকসন দিয়াছিলেন, তাহাতে খানিক্ষণ ঘুম হইয়াছিল, আর কিছু হয় নাই। মুখ দিয়া কোনও ঔষধ ঠাকুরদাকে খাওয়ানো যায় না। তিনি বলেন, 'আমার কোনো অসুখ নেই, ওষুধ খাব কেন? আসল বিমলের সঙ্গে দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অথচ তিনি সমস্ত রাত ঘুমান না। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নাই; অনেক সাধ্যসাধনা করিলে সামান্য কিছু খান। নিজের মনেই কাঁদেন, হাসেন। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছে। সকালকে বলেন সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বলেন সকাল। তারিখ বার কিছুই মনে থাকে না। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন কোনও বিমল ডাক্তারের সহিতই ইঁহার রোগের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহার সহিত দেখা হইয়া গেলেই অসুখ সারিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই কোনও বিমল ডাক্তারের খবর পাইলেই সেখানে ঠাকুরদাকে লইয়া যান। বিমল নাম শুনিলে ঠাকুরদাও আগ্রহ দেখান।

বিস্মিত বিমল. বাবু প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় আপনার ঠাকুরদা?"

"বাইরে গাড়িতে বসে আছেন।"

"নিয়ে আসুন তাঁকে। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। আপনার কাছ থেকে ওঁর হিস্ট্রিটা জেনে নি একটু, উনি হয়তো কিছু বলবেন না। আপনি চেয়ারটায় ভাল করে বসুন—"

যুবকটি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আমিও বিশেষ কিছু জানি না। ঠাকুরদা বরাবরই বিদেশে বিদেশে ঘুরতেন, আমি বোর্ডিংএ হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতাম।"

"আপনার বাবা কোথায় ?"

"আমি শিশু বয়সেই পিতৃমাতৃহীন। নিকট-আত্মীয় বিশেষ কেউ নেই। ঠাকুরদার কাছেই আমি সাত বছর পর্যন্ত ছিলাম। তারপর উনি আমাকে বোর্ডিংএ দিয়ে দেন।"

"বোর্ডিংএর খরচ আপনার ঠাকুরদাদাই দিতেন ?"

"হ্যাঁ। উনি ছাড়া আর তো কেউ নেই আমার।"

"কি করতেন উনি, চাকরি ?"

"না, উনি চিত্রকর। ছবি বিক্রির টাকা থেকেই আমাদের সংসার চলত। বছরখানেক থেকে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ছবি আঁকেন না আর।"

"এখন কি করে সংসার চলে ?"

"আমি রোজগার করি কিছু।"

"কি করেন ?"

"প্রফেসারি।"

যুবকটির কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া বিমল ডাক্তারের হৃদয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইল। ছেলেটি বিদ্বান, অথচ বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ নাই।

"আপনার ঠাকুরদার পাগলামিটা কি ধরনের বলুন তো, কি করেন—"

"নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। রাত্রে ঘুমোন না। আপন মনে বিড়বিড় করে কি বলেন সর্বদা—"

"কি বলেন, শুনেছেন কিছু কখনও ?"

"একটি কথাই বার বার বলেন। 'এ ভার আমি আর বইতে পারছি না—এ ভার আমি আর বইতে পারছি না'। বলতে বলতে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন।"

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

"ওঁর পাগলামিতে আর কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন কি ?"

যুবকটি এইবার একটু মুশকিলে পড়িলেন। সত্য কথাটা বলিলে ডাক্তারবাবু মনে আঘাত পাইবেন কি ? অথচ না বলিলে রোগের সূত্রটা হয়তো তিনি ধরিতে পারিবেন না, অবশ্য উহাই যদি রোগের সূত্র হয়। একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে সব কথা খুলিয়া বলাটাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন।

"করেছি। মনে হয় উনি কোন বিমল ডাক্তারকে খুঁজছেন। ডাক্তারের নাম বিমল না হলে সেখানে যেতেই চান না। আপনার কাছে বিশেষ করে এসেছি সেইজন্যেই—"

"ও। আপনার ঠাকুরদার নামটি কি ?"

"নিরঞ্জন সেন।"

"আপনার নামটি ?"

"বিকাশ।"

"আচ্ছা, আপনার ঠাকুরদাকে নিয়ে আসুন এবার।"

বিকাশবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরে বৃদ্ধ শিল্পী

নিরঞ্জন সেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিমলবাবু দেখিলেন নিরঞ্জন সেনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একমুখ পাকা গোঁফ দাড়ি, মস্তক কেশবিরল। যে কয়গাছি চুল আছে তাহাও পাকা, অবিন্যস্ত এবং তৈলহীন। মুখে জরার চিহ্ন। কপালে, চোখের কোণে বলি-রেখা, গালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের দৃষ্টিই কেবল এখনও বেশ তীক্ষ্ণ আছে। অতীতের সাক্ষী কেবল ওই দৃষ্টিটুকু। বিমলবাবু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে যৌবনের বন্ধু নিরঞ্জনকে তিনি চিনিতে পারিতেন না। নিরঞ্জনকে দেখিয়া মনে মনে তিনি একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধারণা ছিল নিরঞ্জন মারা গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রমাণ সে এতদিন দেয় নাই। দিবার সুযোগও অবশ্য ছিল না। লখ্নৌ হইতে চলিয়া আসিবার সময় বিমল ডাক্তার কোনও ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া আসেন নাই। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটিবার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি লখ্নৌ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। পঞ্চাশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে নিরঞ্জন আসিয়া হাজির হইয়াছে কি মনে করিয়া! চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে।

বিমল ডাক্তার নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনও নির্ণিমেষে বিমলকে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘাড় ফিরাইয়া বিকাশকে বলিলেন—"তুমি বাইরে গিয়ে বোসো। এঁর সঙ্গে আমার গোপনীয় কিছু কথা আছে—।"

বিকাশ ইহা প্রত্যাশাই করিতেছিলেন, প্রতিবারই ঠাকুরদা একথা বলেন। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দুই

আরও কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনই কথা কহিলেন প্রথমে।

"বিমল আমাকে চিনতে পারছ ?"

"পারবার কথা নয়, কিন্তু পেরেছি। ছিলে কোথায় এতদিন ?"

"ছিলাম না কোথায় তাই বরং জিগ্যেস কর। আমি সারাজীবন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। লছমী বেঁচে আছে ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমল ডাক্তার বলিলেন, "আছে।"

"তার যে ছবিটা এঁকেছিলাম সেটা কি আছে তোমার কাছে ?"

"আছে।"

"একবার দেখাও তো—"

"সেটা ভিতরে টাঙানো আছে। ছবিটা দেখতে চাইছ কেন, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

"না। তোমার চেহারা এত বদলে গেছে যে তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না। ছবিটাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি সেই বিমল। বহু বিমল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে তুমি সেই বিমল।"

"বেশ, একটু বোসো তাহলে।"

বিমল ডাক্তার উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ফিরিলেন প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। সঙ্গে একটি বালক ভৃত্য প্রকাণ্ড একখানা ছবি বহন করিয়া আনিল। একটি নর্তকী নাচিতেছে। অপূর্ব ছবি। নিরঞ্জন সেন বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার অতীত কীর্তির

দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার আর সন্দেহ নেই। ছবিটা নিয়ে যেতে পার।"

বালক ভৃত্য ছবিটা লইয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন প্রশ্ন করিলেন—"লছমী কি আমার সঙ্গে দেখা করবে? তাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই। কথাটা খুবই মর্মান্তিক, তবু তার জানা উচিত।"

"কি কথা?"

"তার ছেলে আর বেঁচে নেই। তাকে আমি বড় করে তুলে-ছিলাম, লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, বিয়ে দিয়েছিলাম, তার একটি ছেলেও হয়েছিল, কিন্তু বিধাতার এমনি অভিশাপ প্লেগে ছেলে বউ দু-জনেই মারা গেল, বেঁচে রইল শুধু শিশুটা। তাকেও আমি মানুষ করে তুলেছি। কিন্তু আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, তার জিনিস তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমার আর একটা আতঙ্কও হয়েছে, আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে আমি অভিশপ্ত। লছমীকে পাই নি, লছমী নিজেই আমার কাছে থাকতে চায় নি। সে তোমাকে বিয়ে করেছিল তাই বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে। আমার কাছে থাকলে মরে যেত। ছেলেটাকেও তোমরা যদি নিয়ে নিতে হয়ত সে বেঁচে থাকত—"

নিরঞ্জন সেন রুদ্ধবাক হয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার চোখ হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি বিমল ডাক্তারের হাত দুটি চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বিকাশ তোমাদের কাছেই থাকুক। লছমীকে বল তুমি, তুমি বললেই সে রাজী হবে—"

"সেই বিকাশই কি তোমার সঙ্গে এসেছে?"

"হ্যাঁ। খুব ভাল ছেলে, হীরের টুকরো—"

"ও কি সব কথা জানে ?"

"না। কিন্তু ওকে আমি বলব সব। তার আগে লছমীর মত চাই, তোমারও মত চাই।"

বিমল ডাক্তার মাথায় হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন চলছে চলুক না। ও সব ঘাঁটিয়ে আর লাভ কি—"

"না আমি আর পারছি না। যার জিনিস তার কাছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। ওর ঠাকুরমার কাছেই ও বেঁচে থাকবে, আমার কাছে থাকলে বাঁচবে না। আমি অভিশপ্ত, অভিশপ্ত, অভিশপ্ত—"

নিরঞ্জন সেন চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। বিমল ডাক্তার ভয় পাইয়া গেলেন।

"বেশ, তাই হবে।. বিকাশ আমাদের কাছেই থাকবে। কিন্তু লছমীকে এত বড় মর্মান্তিক খবরটা তো চট করে দেওয়া যাবে না, সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। সে আমি বলব এখন। যদিও ছেলের সঙ্গে ওর বহুকাল ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবু ছেলে তো, তার মৃত্যু-সংবাদটা হঠাৎ এভাবে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের আর কোনও সন্তান হয় নি, ও হয়তো আশা করে আছে যে ওর ছেলে একদিন ফিরে আসবে—"

"তুমি বলবে তাকে ? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ ?"

"দিচ্ছি।"

"কতদিনের মধ্যে বলবে ?"

"এই ধর মাসখানেক।"

"মাসখানেক পরে তাহলে আমি বিকাশকে বলতে পারি ?"

"বেশ, বোলো।"

নিরঞ্জন সেন সোৎসুক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত বিমল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"লছমীর সঙ্গে একবার দেখা হয় না? সে দেখা করবে কি, একবার বলে দেখ না।"

"বললে হয়তো দেখা করবে। কিন্তু এখন দেখা করাটা উচিত নয়। দেখা হলেই ছেলের কথা উঠবে—"

"তাকে একবার দেখতে খুবই ইচ্ছে করছে ভাই—"

"দূর থেকে দেখতে পার। এই জানলাটা খুলে দিচ্ছি, ভিতরের দিকে বারান্দায় বসে আছে সে। ভালোভাবেই দেখতে পাবে এখান থেকে—"

বিমল ডাক্তার পিছনের দিকের একটি জানলা খুলিয়া দিলেন। নিরঞ্জন দেখিলেন বারান্দায় একটি বৃদ্ধা বসিয়া বই পড়িতেছে। মাথার চুল সাদা, মুখে জরার চিহ্ন, চোখে চশমা।

"ওই লছমী !"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য বদলে গেছে।"

"তুমিও বদলেছ, আমিও বদলেছি।"

নিরঞ্জন সেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিন

ঠিক একমাস পরে বিকাশ একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন নিরঞ্জন সেন গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। টেবিলের উপর নিম্নলিখিত পত্রটি রহিয়াছে।

ভাই বিকাশ,

আমি চললাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এই ব্যর্থ জীবন বহন করবার আর কোনো সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। যাবার আগে একটি কথা তোমাকে বলে যেতে চাই। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অনেক কবিতা, অনেক উপন্যাস পড়েছ, তাই আশা করছি আমার প্রথম যৌবনের উন্মাদনাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে। ঘটনাটা সত্যিই গল্পের মতো। প্রথম যৌবনে লখ্নৌ শহরে আমি লছমী নামে একটি নর্তকীকে ভালোবেসেছিলাম। তার সঙ্গে একঘরে বাস করেছিলাম, তার গর্ভে আমার একটি ছেলেও হয়েছিল। লছমীর সুন্দর ছবিও এঁকেছিলাম একটি। ভেবেছিলাম তাকে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ে তুলব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। তার এক ডাক্তার প্রণয়ী জুটল। প্রণয় শেষে এমন গাঢ় হল যে লছমী অবশেষে আমাকে বলল—আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না। আমি ঠিক করেছি বিমলবাবুকে বিয়ে করব। বললাম—সে কি, তোমার ছেলে হয়েছে—! লছমী হেসে উত্তর দিলে, তোমার ছেলে তুমি রাখতে পার, আমি কিন্তু বিমলবাবুকেই বিয়ে করব। জিজ্ঞাসা করলাম, বিমলবাবু বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন? তারপর একটু হেসে বললে, পরশুদিন রেজিস্ট্রি করে আমাদের বিয়ে হয়েও

গেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, সত্যিই আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। তার পরদিনই লছমী কাউকে কিছু না বলে নিজের ছেলেকে ফেলে রেখে আমাকে ছেড়ে চলে গেল বিমলের সঙ্গে। বিমল ডাক্তার ছোট একটি চিঠি লিখে গিয়েছিল—'স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ তোমার আঁকা লছমীর ছবিটি নিয়ে যাচ্ছি। রাগ কোরো না, বন্ধু'। সত্যিই বিমল ডাক্তার আমার বন্ধুই ছিল। তার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি। লছমীর উপর আমার কিন্তু রাগ হল না। মনে হল ওরা উর্বশীর জাত, কোথাও কোনো কারণেই বাঁধা পড়ে না কখনও। নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে ছেলেটিকেই মানুষ করে তুলতে লাগলাম। সে বড় হল, লেখাপড়া শিখল, তার বিয়ে দিলাম, ছেলেও হল একটি। আবার পড়ল অভিশাপের বজ্র। প্লেগ এপিডেমিকে আমার ছেলে বউ মারা গেল, বেঁচে রইল কেবল তাদের শিশু সন্তানটি, মানে তুমি। তোমাকেও আবার মানুষ করে তুলেছি, কি করে তা সম্ভব হয়েছে, কি ভাবে টাকা রোজগার করে তোমার পড়ার খরচ যুগিয়েছি তা তুমি জান না, তা তোমার জানবার দরকারও নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখ শুধু ছবি এঁকে তা হয় নি। এদেশে তা হয় না। এখন আমার ভয় পাছে আমার ছোঁয়াচ লেগে তোমার আবার কিছু হয়। আমার জীবন অভিশপ্ত, আমার কাছে কেউ থাকবে না; তাই ঠিক করলাম লছমীকে খুঁজে বার করব। যদি বার করতে পারি তাকে সব কথা বলে তার হাতে তোমাকে সমর্পণ করে সরে পড়ব। এতদিন সব দায়িত্ব আমি একাই বহন করেছি, এবার সেও করুক খানিকটা। এ দাবি করবার অধিকার আমার আছে। তাই বিমল ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন তার দেখা পেয়েছি। তাকে সব খুলে

বলেছি। সে রাজী হয়েছে। এইবার তুমি তোমার ঠাকুমার কাছে ফিরে যাও। বাস্, আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি চললাম! আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও, যে আদর্শে তোমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি তা যেন তোমার জীবনকে মহিমান্বিত করে। ইতি

তোমার দাদু।

চার

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ের পথে একটি বৃদ্ধাকে স্কন্ধে লইয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিতেছেন। সম্মুখে চড়াই, তাহার পরই একটি চটি। সময় মতো চটিতে পৌঁছিতে না পারিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যদিও ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হইতেছিল তবু সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি ক্ষণকালের নিমিত্তও শ্লথগতি হন নাই।

নাতি ঠাকুরমাকে কেদার-বদরী দর্শন করাইতে লইয়া চলিয়াছে। ডানডিতে লইয়া যাইবার মতো সঙ্গতি নাই, ঠাকুরমারও হাঁটিবার শক্তি নাই, অগত্যা তাই কাঁধে করিয়া লইতে হইয়াছে। যথাসময়ে তাহারা চটিতে পৌঁছিয়া গেল। পরদিন ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রা শুরু হইবে। সামনে আর একটা নাকি চড়াই আছে। আহারাদির পর যে যেখানে স্থান পাইল শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধা ও তাঁহার নাতিও একবার শয়ন করিলেন।

...গভীর রাত্রি। বাহিরে শনশন করিয়া হাওয়া বহিতেছে, চটির সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমান নাই কেবল বৃদ্ধা। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার নাতিকে ডাকিলেন।

"বিকাশ, ঘুমুচ্ছ না কি ?"

"কি হয়েছে ?"

বিকাশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"কিছু হয় নি। তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই আজ। অনেকদিন থেকেই বলব ভাবছি, উনি বলতে মানা করেছিলেন বলেই এতদিন বলি নি। আজ উনি নেই, তোমার ঠাকুরদাও নেই, আমি কেদার-বদরী দর্শন করতে যাচ্ছি তোমার কাঁধে চড়ে, আমার মন কিন্তু বলছে কথাটা তোমাকে না বললে আমার তীর্থ দর্শনের পুণ্য হবে না—"

"কি কথা ?"

"আমি তোমার ঠাকুমা বলেই তো তুমি এত কষ্ট সহ্য করে আমাকে কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ—"

"নিশ্চয়ই। এটা আমার কর্তব্য।"

"কিন্তু আমি তোমার ঠাকুমা নই।"

"তার মানে ?"

"আমি লছমী নই, আমার নাম দুর্গা। লছমী ওঁর কাছেও বেশীদিন থাকে নি, ছ-মাস পরেই পালিয়েছিল। তারপর উনি আমাকে বিয়ে করেন। তোমার ঠাকুরদা যখন ওঁর কাছে এসে-ছিলেন তখন সত্যি কথাটা উনি তাঁকে বলেন নি। ভেবেছিলেন মিথ্যা কথা বললে হয়তো উনি সান্ত্বনা পাবেন। হয়তো ওঁর পাগলামি সেরে যাবে। তারপর ঠাকুমা বলে তুমি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালে তখন আমার অন্ধকার ঘরে যেন আলো জ্বলে উঠল। তখন প্রাণ ধরে আমি বলতে পারলাম না তুমি আমার কেউ নও। তারপর দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল। উনিও চলে

গেলেন, আমার ছেলে-মেয়ে হয় নি, তুমিই আমার আশ্রয়, নির্ভর, সব। আমাকে কাঁধে করে তুমিই কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু কেবলই আমার মনে হচ্ছে সত্যি কথাটা তোমাকে বলা উচিত। সত্যি কথা শুনে তুমি আমাকে যদি এখানে ফেলে রেখেও চলে যাও তা-ও বরং আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু মিথ্যার বোঝা বুকে লুকিয়ে রেখে আমি কেদার-বদরী যেতে পারব না, গেলে পাপ হবে, পুণ্য হবে না।”

বিকাশ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার গোড়ার কথা মনে পড়িল। ঠাকুমার অতীত জীবনকে ঘিরিয়া যে রূপকথা-লোক তিনি মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাও চুরমার হয়ে গেল। কিন্তু তিনি একটি কথা বলিলেন না।

“এ কথা শোনার পর আমাকে কাল নিয়ে যাবি তো?”—বৃদ্ধা প্রশ্ন করিলেন।

“নিশ্চয় তুমিই আমার ঠাকুমা। ঘুমিয়ে পড়, খুব ভোরে উঠতে হবে কাল। সামনেই চড়াই আছে—”

পাঁচ

বিকাশের সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। আলোর আভাস দেখা যেতেই তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঊষার অরুণরাগে পূর্বাকাশ রঞ্জিত। মেঘে মেঘে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে স্বপ্নলোক মূর্ত হইয়াছে; সহসা বিকাশের মনে হইল ওই তো আমার ঠাকুমা। তিনিও তো ঊষার মতো চঞ্চলা অবন্ধনা ছিলেন···।

তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"দাদু, দাদু, বিকাশ, কোথা গেলি দাদু—"

বৃদ্ধা ঘরের ভিতর হইতে আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল বিকাশ বুঝি তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

"এই যে ঠাকুমা, যাচ্ছি, এবার ওঠ। বেরুতে হবে এক্ষুনি।"

একটু পরেই দেখা গেল বিকাশ বৃদ্ধাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চড়াই ভাঙিতেছেন। আকাশে ঊষা নাই, চতুর্দিকে কেবল পাহাড়…।

সবিলা

জনৈক খবরের কাগজের রিপোর্টার তাসের আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে যে মেয়েটিকে কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, সে-মেয়ে যে রাজকন্যা, তা বেচারা বুঝতে পারে নি। সুতরাং তার সঙ্গে প্রেম করতেও ইতস্তত করে নি। প্রেম যখন জমে উঠল, তখন হঠাৎ জানা গেল ওই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটির আসল পরিচয়। এতে উক্ত সাংবাদিক যুবকটির মনের অবস্থা যা হল তা বর্ণনীয় নয়, অনুমেয়। বিখ্যাত একটি বিদেশী চলচ্চিত্রে এর শিল্পায়িত অভিব্যক্তি অনেকেই আপনারা দেখেছেন।

সবিলার জীবনেও এই রকম একটি কাণ্ড ঘটেছিল। সবিলা সাংবাদিক নয়, সহিস। সিকিমের একপ্রান্তে তার বাড়ি। সিকিমের রাজার অশ্বশালার সে একজন পরিচারক মাত্র। কিন্তু তবু সে অসামান্য ব্যক্তি, ধর্মের জ্যোতিতে তার মনপ্রাণ পরিপূর্ণ। সে মুসলমান, তার আকাঙ্ক্ষা বাড়ির পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করাবে। আয় অল্প, কিন্তু তার থেকেই সে একটু করে টাকা জমিয়েছে অনেক দিন ধরে। জমিও সংগ্রহ হয়েছে একটু একটু চাঁদাও সংগ্রহ করেছে কিছু-কিছু। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ মসজিদ নির্মাণ অল্প টাকায় হবে না, অনেক টাকা চাই। প্রায় দশ বৎসর ধরে চেষ্টা করে মসজিদের ভিত্তি পত্তন করতে পেরেছে সে। তার জন্যেই মালমশলা

ইঁট সিমেণ্ট সংগ্রহ করতে জিব বেরিয়ে পড়েছে তার। ঋণ হয়ে গেছে কিছু। তবু সে হাল ছাড়ে নি। আবার একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিল, এমন সময় এই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটল। কোট-প্যাণ্ট-পরা একটি সাহেব এসে হাজির হলেন তার কাছে। খাঁটি সাহেব নয়, দেশী সাহেব। চমৎকার লোক কিন্তু। খাসা উর্দুতে বললেন, "আমি পায়ে হেঁটে এই অঞ্চলটা বেড়িয়ে দেখতে চাই, দশ-বারো দিনের মত থাকবার জায়গা কি পাওয়া যাবে কোথাও?"

"এখানে তো হোটেল বা সরাই নেই সাহেব। এ-অঞ্চলে আমরা দশ-বারো ঘর সহিস আছি কেবল। সবাই মুসলমান। আমার গরিবখানায় থাকতে হুজুরের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনার খিদমত করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।"

সাহেব বললেন, "ও, তুমি মুসলমান বুঝি? যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার গরিবখানাই যে আমার মত মুশাফিরের পক্ষে দৌলতখানা ভাই। তুমি মুসলমান, কত বড় সংস্কৃতির বাহক তুমি—"

পর পর দু-তিনটে উর্দু বয়েত আওড়ালেন, কোরানের কথা বললেন। মুগ্ধ হয়ে গেল সবিলা।

সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন সাহেব। সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসতেন, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। সবিলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল তাঁর। চাচা-সাহেব বলে ডাকতে লাগল তাঁকে তারা।

একদিন পাশের জমিতে মসজিদের অর্ধ-সমাপ্ত ভিত্তিটা চোখে পড়ল তাঁর।

"ওটা কী সবিলা? নূতন বাড়ি করছ?"

একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সবিলা।

"ওটা আমার পাগলামি হুজুর। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার চেষ্টা—"

"কী ব্যাপার বল তো খুলে।"

কুণ্ঠিতমুখে চুপ করে রইল সবিলা খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "হুজুর আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা একটি মসজিদ তৈরি করব। অনেকে আমার কথা শুনে হাসে, ঠাট্টা করে, কিন্তু তবু আমি চেষ্টা করছি—"

সাহেব বললেন, "দেখ সবিলা, এতদিন তোমাকে আমি আমার মতই সাধারণ মানুষ মনে করতাম। এখন দেখছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়। তোমার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এতদিন বুঝতে পারি নি, দেখতে পাই নি। তোমাকে আমি শ্রদ্ধাভরে সেলাম করছি। একটা কথা তুমিও বুঝতে পার নি সবিলা, তোমার মসজিদও তৈরি হয়ে গেছে, তার মিনারও আকাশ স্পর্শ করেছে। স্থান পেয়েছে সূর্যতারার সভায়—"

সবিলা অভিভূত হয়ে শুনছিল; সাহেব থামতেই সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে? এ কী বলছেন আপনি হুজুর—! কিছুই হয় নি, দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "হয়ে গেছে। যে-মুহূর্তে তুমি সঙ্কল্প করেছ সেই মুহূর্তেই তা হয়ে গেছে। তোমার মতো পুণ্যাত্মার সঙ্কল্প পূর্ণ হতে দেরি হয় না। ইঁট সিমেণ্ট চুন-সুরকি যোগাড় করতে হয়তো দেরি হচ্ছে, কিন্তু তা-ও হয়ে যাবে। টাকা কী করে যোগাড় করছ তুমি?"

"নিজে কিছু কিছু জমাচ্ছি। চাঁদাও পেয়েছি কারো কারো কাছ থেকে। কিন্তু এখানে তো লোকজন বেশী নেই, যারা আছে তারাও গরিব—"

"বেশ, আমি তোমাকে কিছু চাঁদা দিচ্ছি।"

সাহেব নগদ দশ টাকা দিলেন তাকে। আর একটি ইংরেজীতে ঠিকানা-লেখা কার্ড দিয়ে বললেন, "তুমি যদি কখনও কলকাতায় যাও, এই ঠিকানায় আমার খোঁজ কোরো। আমি তোমাকে আরও চাঁদা যোগাড় করে দেব!"

তার পরদিনই নেমে এলেন সাহেব পাহাড় থেকে।

দুই

তারপর তিন বৎসর কেটে গেছে।

কলকাতা শহরে প্রকাণ্ড একটি বাড়ির বাইরের ঘরে বহু রোগীর ভিড়ে সংকুচিত হয়ে বসে আছে সবিলা। প্রায় ঘণ্টা দুই বসে থাকতে হল। সব রোগী দেখা শেষ করে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সাহেব। সবিলা তখনও এক কোণে বসে ছিল। চোখাচোখি হল দুজনে। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ডাক্তার সাহেব। হাত বাড়িয়ে উর্দুতে বললেন, "আরে সবিলা সাহেব যে! কী খবর!…"

সবিলা কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, আমার মসজিদের জন্যে কিছু চাঁদা যোগাড় করে দেবেন।"

"নিশ্চয় দেব। ভিতরে এস!"

সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

"একটু চা খাও, নাস্তা কর। তারপর আমি তোমাকে একটা চিঠি দিচ্ছি, সেই চিঠি নিয়ে তুমি চলে যাও। যাঁর নামে চিঠি দেব তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

তিন

তার পরদিন আবার এল সবিলা।

ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

"টাকা পেয়েছি।"

"কত টাকা ?"

"প্রায় তিন হাজার টাকা।"

"ওতে তোমার মসজিদ হয়ে যাবে তো ?"

"হয়ে যাবে। আদাব।"

এত টাকা পেয়েও সবিলা কিন্তু ততটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারল না যতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত ছিল।

সে আবিষ্কার করেছিল যে, ডাক্তার সাহেব মুসলমান নন, হিন্দু।

অপ্রতিভ মুখে আদাব করে চলে গেল সে।



অতিদূর ভবিষ্যতে

যে গল্পটি লিখিতেছি তাহার পরিবেশ বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ। অনতিদূর ভবিষ্যৎ নহে, অতিদূর ভবিষ্যৎ। সে যুগে মানুষের প্রতিপত্তি নাই, জন্তুজানোয়ারদেরই বাড়বাড়ন্ত। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। মানুষই একদা বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া জানোয়ারদের সভ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সে চেষ্টা মর্মান্তিকরূপে সফল হইয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষিত সভ্য জানোয়ারদের কবলে পড়িয়া বহু নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন। হস্তীরা যখন রাজা হইয়াছিল তখন তাহারা আইন করিয়াছিল যে মানুষ দেখিলেই তাহাকে শুঁড়ে জাপটাইয়া তুলিয়া আছাড় দিতে হইবে। সিংহ-ব্যাঘ্রদের আমলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়! বোলতা-ভীমরুলগণ সম্মিলিতভাবে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিল। সে সময় প্রতিটি মানুষের চেহারা এত বীভৎস হইয়াছিল যে চেনা যাইত না। যে যন্ত্রণা তাহারা ভোগ করিয়াছিল তাহা জনৈক মানব-কবি একটি কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাব্য রাজদ্রোহসূচক বলিয়া ভস্মীভূত করা হয়, কবিকেও লক্ষ লক্ষ বোলতা এবং ভীমরুলের হুলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এই ভাবে বারম্বার আক্রান্ত হইয়া মানুষেরা ক্রমশ সংখ্যায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যাহারা

আছে তাহারা জানোয়ারদের অধীনে থাকিয়া জানোয়ারদের নির্দেশ মানিয়া কোনক্রমে জীবনযাপন করিতেছে।

যখনকার কথা লিখিতেছি তখন গর্দভ সম্প্রদায়ের রাজত্ব। ঘোড়ারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্বাচন-যুদ্ধ আসন্ন। কী হয় বলা যায় না।

সে যুগের জনৈক মানব-লেখক একটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন। ই-যন্ত্রের অর্থ ইচ্ছাশক্তি-যন্ত্র। আণবিক যুগ অতীতের পর্যায়ে পড়িয়া গিয়াছে। মনোময় যুগ চলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যে কোনও মানুষের ইচ্ছা ই-যন্ত্রযোগে অপরের মনে সঞ্চালিত হইয়া অঘটন ঘটাইতেছে। এমন কি যাহারা কুরূপ তাহারা সুরূপ হইতেছে, বামনগণ দৈত্যে পরিণত হইয়াছে। জন্তুজানোয়ারদের চেহারাও মনুষ্যাকৃতি লাভ করিয়াছে। ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই ইচ্ছানুরূপ ফল ফলিতেছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তিশালী মানব ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা কিন্তু এই যন্ত্রে সুফল ফলে না। তাই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবদের এখনও কিছু আধিপত্য আছে!

যে লেখকটি ই-যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল। তিনি যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়া দূরবাসিনী কোনও তরুণীর অনমনীয়তাকে নমনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

এমন সময় গর্দভ রাজ্যের প্রচার-সচিব আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

'ও মশাই, একটা মুশকিল হয়েছে। জানেন তো ঘোড়াদের প্রজাবৃদ্ধি হলেই আমরা ভোটে হেরে যাব। তাই আমরা সমস্ত পুরুষ ঘোড়াগুলিকে বন্দী করে রেখেছিলাম। খবর পেলাম কয়েকটি পুরুষ ঘোড়া বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে। চর এসে খবর দিলে

যে তারা কতকগুলি তরুণী ঘোটকীর সঙ্গে মিলিতও হয়েছে। শুনছি শ দুই ঘোটকী গর্ভবতী। আপনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন, যেন একটি ঘোটকীও সন্তান প্রসব করতে না পারে।'

'যে আজ্ঞে।'

তটস্থ লেখক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যাহা সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। গর্দভ-রাজ্যে উক্ত লেখকটি প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তিবলে সমস্ত ঘোটকীগুলি নাকি ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল, একটিও বাচ্চা হয় নাই।

উচিত-অনুচিত

যাহা চিরকাল ঘটে তাহাই ঘটিতেছিল।

মিত্তিরদের বাড়ির শফরী বসুদের বাড়ির ক্যাবলার সহিত এমন মাখামাখি আরম্ভ করিয়াছিল যে শহরসুদ্ধ সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। সেকাল হইলে শফরীর পিতা কুঞ্জনাথকে এক ঘরে করিয়া ইহার প্রতিকার করা চলিত। কিন্তু কালের চাকা ঘুরিয়াছে, এখন ফুসফুস গুজগুজ করা ছাড়া অন্য কিছু করিবার উপায় নাই।

সকালে দেখা যায় শফরী ও অশোক (ক্যাবলার ভালো নাম) শহরের বাহিরে যে মাঠটা আছে সেখানে গিয়া সাইকেল চড়া প্র্যাক্‌টিস করে। অশোক শেখায়, শফরী শেখে।

দুপুরে আহারাদির পর অশোক শফরীদের বাড়িতে যায়। সেখানে প্রায় বেলা পাঁচটা পর্যন্ত তাস খেলা চলে। শফরীর মা এবং বিধবা পিসীমাও খেলায় যোগদান করেন। পান ও দোক্তার শ্রাদ্ধ হয়। অশোক মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখায়, তাসের ম্যাজিক। দুপুরটা বেশ আনন্দে কাটে। শফরীর পিতা কুঞ্জনাথ মিত্র ক্যাবলার পিতা হরগোবিন্দ বসুর বাল্যবন্ধু। সুতরাং এ মেলামেশায় কেহই দোষের কিছু দেখেন না। শফরী ঘরের মেয়ে, ক্যাবলাও ঘরের ছেলে। উভয়েরই পিতামাতার ধারণা তাঁহাদের পুত্রকন্যা কুসুমের মতো নির্দোষ।

তাস খেলা শেষ করিয়া অশোক শফরীকে লইয়া সিনেমায় যায়।

সন্ধ্যাবেলাটা প্রায় সিনেমাতেই কাটে। রাত্রে তাহারা কোথায় থাকে, কী করে তাহা কেহ জানে না। নেপথ্যে ফুসফুস গুজগুজ হইতে থাকে।

আমি তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। আমাদের মহলেও অর্থাৎ উচ্চপদস্থ হাকিমমহলেও ইহা লইয়া সরস আলোচনা চলিত। কুঞ্জবাবু আমার আপিসে কাজ করিতেন আর হরগোবিন্দবাবু করিতেন আবগারি বিভাগে। একজন বিহারী অফিসার একদিন কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আজকালকার মেয়েরা যেরূপ দ্রুতবেগে প্রগতির পথে ধাবিত হইতেছেন তাহাতে ভবিষ্যতে প্রাদেশিকতা জিনিসটা আপনিই উঠিয়া যাইবে। বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

আমার খুব খারাপ লাগিল। কয়েকদিন পরে আমি আমার একজন সাব-ডেপুটিকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম, "অশোকের সঙ্গে শফরীর বিয়ে তো অনায়াসে হতে পারে। ওরা পালটি ঘর। আপনি একটু ঘটকালি করুন না।"

"আচ্ছা, স্যর।"

দিন দশেক পরে নিত্যানন্দবাবু (সেই সাব-ডেপুটি) আসিয়া আমাকে খবর দিলেন।

বলিলেন, "বিয়ে হওয়া শক্ত। হরগোবিন্দবাবুকে আমি বলেছিলাম, তিনি বললেন, তাঁর ছেলের বিয়ে দেবার মালিক তিনি নন, তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্ত্রী যদি মত করেন তিনি আপত্তি করবেন না। ওঁদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত আছে। আমার স্ত্রীকে বললুম হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রীর কাছে কথাটা পাড়তে। আমার স্ত্রী কথাটা পেড়েছিল কাল। হরগোবিন্দবাবুর স্ত্রী কথাটা শুনে যেন আঁতকে

উঠলেন। বললেন, 'ওই বেহায়া মেয়ের সঙ্গে আমি আমার অমন ছেলের বিয়ে দেব, বলছেন কী আপনি! কত ভালো বংশের সুন্দরী মেয়ে সাধাসাধি করছে! ওই কী ক্যাবলার যোগ্য মেয়ে'।"

কুঞ্জবাবুর অভিমতটা কী তাহাও আমি জানিয়াছিলাম। কুঞ্জবাবুর ধারণা তাঁহার মেয়ের যে রকম রূপ গুণ তাহাতে অনেক বড় ঘরে তাহার বিবাহ হইবে। সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, লেখাপড়া জানে, অনেক কিছু জানে। তা ছাড়া উহারা দুইজনে ভাই-বোনের মতো মানুষ হইয়াছে, উহাদের বিবাহটা বড়ই অশোভন হইবে।

কিছুদিন পরে যাহা অনিবার্য তাহাই ঘটিল। শফরীকে লইয়া অশোক একদিন সরিয়া পড়িল। তাহার পর কী হইয়াছিল জানি না, কারণ আমিও বদলি হইয়া গেলাম।

দুই

তাহার পর পাঁচ বছর কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার একটি নামজাদা প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সিনেমা দেখিতেছি। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম। এ কী! এ যে সেই শফরী আর ক্যাবলা! তাহারাই নায়ক-নায়িকা। পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া চুম্বন করিতেছে। কী আর করিব, বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহারা বেশ ভালো অভিনয়ই করিতেছে। বলা বাহুল্য, এখন তাহাদের শফরী আর অশোক নাম নাই। চিত্র-জগতে নতুন নামে তাহাদের পরিচয়। সত্যই বেশ ভালো অভিনয় করিতেছে! আমার পিছনে যাঁহারা বসিয়া ছিলেন তাঁহারাও দেখিলাম উচ্ছ্বসিত।

"উঃ, কী চমৎকার অ্যাক্টিং করছে।"

"গুণ আছে, তা না হলে অত টাকা দিয়েছে। দশ হাজার করে। আরও কনট্রাক্ট পেয়েছে…"

পিছনের সীটে এই জাতীয় আলোচনা চলিতেছিল। শফরী আর ক্যাবলা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে ইহাতে আনন্দিত হইলাম। মনে হইল, এই হওয়াই তো উচিত।

ইনটারভাল হইল।

দেখিলাম পিছনের সীটে বসিয়া আছেন কুঞ্জনাথ, হরগোবিন্দ এবং আরও দুইটি প্রৌঢ়া মহিলা। সম্ভবত কুঞ্জনাথ এবং হরগোবিন্দের স্ত্রী। সকলেরই মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। কুঞ্জনাথ আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, নমস্কার করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

তিন

ইহার পর আরও পনেরো বৎসর কাটিয়াছে।

আমার কলিকাতার বাসায় একদিন সকালে শফরী আর ক্যাবলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে একটি মেয়ে। চমৎকার মেয়েটি। যেমন রঙ তেমনি মুখ-চোখ।

শফরী প্রণাম করিয়া বলিল; "জ্যাঠামশাই, চিনতে পারেন আমাদের ?"

ক্যাবলাও প্রণাম করিল। মেয়েটিও করিল।

"শুনলাম আপনি কোলকাতাতেই আছেন। চিনতে পেরেছেন আমাদের ?"

"তোমরা তো বিখ্যাত লোক, না চেনবার কি আছে।"

"এ মেয়েটি কে ?"

"আমাদেরই মেয়ে। রুমা।"

"বাঃ, খাসা মেয়েটি। পড়াশোনা করছে তো ?"

"এ বছর ম্যাট্রিক দেবে।"

"বাঃ..."

শফরী তাহার পর আসল কথাটি পাড়িল।

"আমরা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ছোট বয়সেই মেয়েটির বিয়ে দিতে চাই, যা দিনকাল পড়েছে। আপনার ছেলেটি তো এবার ডাক্তারি পাশ করেছে। আপনি আমাদের পালটি ঘরও। নিন না রুমাকে—"

বললাম, "আমার ছেলে এই সবে পাশ করেছে। আগে কিছু রোজকার করুক, সেট্‌ল্‌ড্‌ না হলে—"

শফরী বলিল, "যদি কিছু না মনে করেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই। বলব ?"

"বল—"

"আমাদের ওই একটিমাত্র মেয়ে। ওকে এক লক্ষ টাকা দেব আমরা। আমাদের যে জামাই হবে তার যাতে কোনও আর্থিক অসুবিধা না হয় সে ব্যবস্থা আমরা করব।"

"আচ্ছা ভেবে দেখি—"

প্রণাম করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

খবর লইয়া জানিলাম শফরী এবং ক্যাবলার তিন আইন অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। রুমা জারজ নয়। তবু কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি নাই। কোথায় যেন একটু বাধিল।

দন্ত-কৌমুদী

যাহারা পতিতা, যাহারা নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে, তাহাদের ঘৃণা করা উচিত—সুনীতিপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদের ইহাই নির্দেশ। তাঁহারা আরও বলেন, তাহাদের সংস্রবও পরিহার্য। প্রথম উপদেশটি এতদিন পালন করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টি পারি নাই। কারণ আমি ডাক্তার, রোগিণী আসিয়া উপস্থিত হইলে সে পতিতা কি সতী এ বিচার করা চলে না, তাহার চিকিৎসায় মন দিতে হয়, সুতরাং সংস্রব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই দ্বিতীয় উপদেশটি পালন করা সম্ভব হয় নাই। আজ দেখিতেছি, প্রথম উপদেশটির মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারিলাম না। চাহনির উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিতে হইল। সবাই তাহাকে চাউনি বলিয়া ডাকিত। বিহারীরা বলিত, নজরিয়া। আমি নামটাকে একটু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। চাহনি নামজাদা পতিতা ছিল না, চিত্র-তারকা হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাহার ফী ছিল মাত্র এক টাকা। পথচারিণী ছিল সে।

সে আমার নিকট প্রথম যখন আসিয়াছিল তখন সে সিফিলিসে জর্জরিত। অনেকগুলি ইনজেকশন দিয়া তাহাকে ভালো করিলাম। আমার ফী দিতে কোনদিন সে কার্পণ্য করিত না, কেবল শেষের ফীটা সে দিতে পারে নাই, হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল, এখন

হাতে পয়সা নেই ডাক্তারবাবু, পরে দিয়ে যাব। বিশ্বাস করুন আমাকে, নিশ্চয় দিয়ে যাব।

বছর খানেক পরে আবার আসিয়াছিল সে। আমার ফী আনে নাই, নতুন একটা সমস্যা সমাধান করিবার জন্য পরামর্শ চাহিতে আসিয়াছিল।

বলিল, আমার দাঁতগুলো দেখুন তো ডাক্তারবাবু। দেখিলাম, দাঁতগুলি মজবুত আছে, কিন্তু প্রত্যেকটিই কুচকুচে কালো। মিশি, গুল এবং পান-দোক্তাই কারণ। বলিলাম, দাঁত তো ভালোই আছে। রঙ অবশ্য কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

চাহনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

এ কালো রঙ উঠিয়ে দেওয়া যায়?

যায়, কিন্তু অনেক হাঙ্গামা। এখানে হবে না। কোলকাতা যেতে হবে। থাক না কালো রঙ, ক্ষতি কি?

চাহনি বলিল, আজকাল ঝকঝকে সাদা দাঁত সবাই চায়। আমার খদ্দের অনেক কমে গেছে।

বলিয়া মাথা হেঁট করিল। তাহার পর বলিল, কোলকাতাই চলে যাই তা হলে। রেশমীও এই কথা বলছিল। আপনিও যখন বলছেন তখন সেই ব্যবস্থাই করি।

যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, আপনার ফীয়ের কথা ভুলি নি, পাঠিয়ে দেব পরে। বড় টানাটানি চলছে আজকাল।

চলিয়া গেল।

তাহার পর আরও পাঁচ বছর কাটিয়াছে। চাহনির কোনও খবর আর পাই নাই। আজ সকালে একটি ঘাড়-ছাঁটা ছোকরা একটি চিঠি এবং একটি সীল-করা কৌটা আমার হাতে দিয়া গেল। বলিল, চাউনি এটা কোলকাতা থেকে আপনাকে পাঠিয়েছে।

কী আছে কৌটোতে ?

তা তো জানি না।

ছোকরা চলিয়া গেল।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। আঁকা-বাঁকা লেখা, অজস্র বানান ভুল। ভাষাতেও গুরু-চণ্ডালী দোষ। সংশোধন করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

শ্রীচরণেষু,

শত সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন,

ডাক্তারবাবু, ভগবানের কৃপায় আশা করি আপনি ভালো আছেন। আশা করি এ অভাগীর কথা আপনার মনে আছে। আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কলিকাতায় আসিয়া একজন বড় দাঁতের ডাক্তারকে আমার দাঁতগুলি দেখাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সব দাঁতগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লও। সবগুলি না পার, অন্তত সামনের কয়টি বাঁধাইয়া লও। দেখিতেও ভালো হইবে, দাঁতগুলি অনেকদিন টিকিবেও। আমার যে কয়খানা গহনা ছিল তাহা বেচিয়া সোনা দিয়া দাঁত বাঁধাইয়া লইলাম। ইহাতে ফলও হইয়াছিল। এখানেই নূতন করিয়া আবার ব্যবসা ফাঁদিয়াছিলাম। লোক মন্দ জুটিত না। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমার অদৃষ্টই মন্দ। আবার ব্যায়রামে পড়িলাম। এবার যক্ষ্মা। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, বাঁচিবার আশা কম। অনেক টাকা খরচ করিলে কিছুদিন

বাঁচিতে পারি। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইব না। আমার টাকা আর নাই, চিকিৎসায় এবং বাড়িভাড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বাঁচিব না। আপনার সহিত আর আমার দেখাও হইবে না। আপনার কিছু ফী বাকি ছিল, সে কথা আমি ভুলি নাই। আপনার ঋণ শোধ করিবার নয়, তবু ফী বাবদ কিছু পাঠাইতেছি। আমার কাছে নগদ টাকা নাই। আমার সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলিই আপনাকে একটি কৌটায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। পাড়ায় একটি ছোকরা দাঁতের ডাক্তার আছে, সে-ই কোনো পয়সা না লইয়া দাঁতগুলি উপড়াইয়া দিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। রেশমীর ছেলে খোনতা এখানে আসিয়াছিল, তাহার হাতেই পাঠাইলাম। আপনি গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি

সেবিকা

চাহনি

আলোবাবু

সবাই তাঁকে আলুবাবু বলত, কিন্তু তাঁর আসল নাম আলো। চেহারা অবশ্য নামের উপযুক্ত নয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মুখটি বেগুন পোড়ার মতো, তার উপর কালো গোঁফ-দাঁড়ি, যুগ্ম-ভ্রূ, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। গলায় তুলসীর মালা, সেটিও কালো হয়ে গেছে। পরনের থানখানি অবশ্য ধপধপে সাদা। গায়ের চাদরখানিও সাদা। আলুবাবু জামা গায়ে দিতেন না। জুতোও পরতেন না।

একদিন সকালে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই দিনই প্রথম দেখলাম তাঁকে।

"কি চাই আপনার ?"

"অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করবেন আমাকে ?"

সাহায্যপ্রার্থী অনেক আসে, অধিকাংশ লোকই টাকা চায়, ভাবলাম ইনিও বোধ হয় সেই দলের। মনে মনে একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখ ফুটে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারলাম না। বরং বললাম, "অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন, কি করতে হবে—"

তাঁর বাঁ হাতে একটি ছোট থলি ছিল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তিনি একটি ছোট পাখির ছানা বার করলেন।

"একটা ছোঁড়া এই পাখির ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে

নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি দু আনা পয়সা দিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে এর পায়ে লেগেছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল কিনা, একটু দেখবেন দয়া করে? শুনেছি আপনি বড় ডাক্তার।"

দেখলাম পাখির ছানাটিকে। পায়ে সত্যিই লেগেছিল। টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে বেঁধে দিলাম।

"কি করবেন এটাকে নিয়ে, পুষবেন?"

"না। ভালো হলে ছেড়ে দেব। জীবন্ত কোনো জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেই জন্যে বিয়েও করি নি।"

কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে একটু হেসে চাইলেন আমার দিকে।

"ও। এর আগে তো দেখি নি আপনাকে, কোথা থাকেন।"

"অবিনাশ বাবুর বাড়িতে। দিন সাতেক হল এসেছি।"

আর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলেন। অবিনাশ বাবু এখানকার নামজাদা উকিল একজন।

"অবিনাশবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি?"

"না, তেমন কিছু নয়। আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নির বন্ধুর শ্বশুর উনি। আসলে লোক খুব ভালো। তাই দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।"

আলোবাবু পাখির ছানাটি নিয়ে চলে গেলেন।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে আলোবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। দেখলাম তিনি একটি দিশি কুকুরের বাচ্চার পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। আমাকে

দেখেই এক মুখ হেসে বললেন, "বিনুবাবুর কুকুর এটি। কুকুর পোষার শখ আছে কিন্তু সেবা করতে জানে না। দুটো চোখে এতক্ষণ পিঁচুটি ভরতি ছিল, তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলুম। আর কুকুরকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখলে কি চলে? ওদের সঙ্গে খেলা করতে হয়—"

কুকুরটার দিকে চেয়ে তার মুখের সামনে টুসকি দিতে লাগলেন। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল কুকুরটা। বিনু অবিনাশের ছেলে, বয়স দশ বছর।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হল একটু পরে।

বললাম, "আপনার এই আলোবাবু লোকটি তো অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ অদ্ভুতই। স্নেহের কাঙাল বেচারা। গরীবও খুব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, এক পাখি পেশেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে।"

"দেখবেন তো, যদি ওর চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কোথাও। সেবা করতে বড় ভালোবাসে, বিশেষত সেবার পাত্র বা পাত্রী যদি অসহায় হয়—"

দিন কতক পরে সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা হল। এক সঙ্গে কলেজে পড়েছিলুম। কথায় কথায় আলোবাবুর কথা উঠে পড়ল। সিভিল সার্জন বললে, "এখনকার হাসপাতালে ওকে প্রবেশনার ড্রেসার করে ঢুকিয়ে নিতে পারি। তবে দশ টাকার বেশি এখন পাবে না। পরীক্ষায় পাশ করলে তখন মাইনে বাড়বে—"

আলোবাবু হাসপাতালের আউট-ডোরে রোগীদের ঘা ধোয়াতে লাগলেন। মাসখানেক পরেই কিন্তু চাকরিটি গেল তাঁর। একদিন দেখি আমার ল্যাবরেটরিতে এসে শুষ্ক মুখে বসে আছেন।

"কি খবর—"

"আমাকে দূর করে দিলে।"

"কেন?"

"একটা লোকের পায়ের ঘা কিছুতেই সারছিল না। সে-ই আমাকে একটা ওষুধ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই ওষুধটা দাও তাহলে সেরে যাবে। ওটা লাগিয়ে অনেকের নাকি সেরে গেছে। দিলুম ওষুধটা লাগিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিলে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি তো চটেই লাল, বললেন, কার হুকুমে তুমি ঘায়ে কার্বলিক এসিড ঢেলে দিয়েছ। আমি আর কি বলব চুপ করে রইলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে দূর করে দিলেন। আমি ওর ভালোর জন্যেই ওষুধটা দিয়েছিলাম আর ওর কথাতেই দিয়েছিলাম—"

আমিও চুপ করে রইলাম, কি আর বলব। সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলোবাবু চলে গেলেন।

কষ্ট হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্য, কিন্তু কি করব ভেবে পেলাম না।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকেও বিদায় নিতে হল আলোবাবুকে। শুনলাম অবিনাশবাবুর স্ত্রী দূর করে দিয়েছেন তাঁকে। আলোবাবু যা করেছিলেন তা কোনও মা সহ্য করতে পারেন না। তিনি এক বগলে কুকুর বাচ্চাটা এবং আর এক বগলে অবিনাশ বাবুর শিশু-পুত্র তিনুকে নিয়ে একবার কুকুরটার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনুর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন।

অবশেষে আমিই আশ্রয় দিলাম আলোবাবুকে।

একদিন সন্ধ্যের পর এসে দেখলাম তিনি একটা সোলার হ্যাট বাজিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন।

"আপনি গান বাজনা জানেন নাকি—"

কুণ্ঠিতমুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"এককালে ডুগি-তবলা বাজাতে পারতাম। দৈন্যের দায়ে সব বেচে দিতে হয়েছে। এখন হ্যাট বাজাই—"

বলা বাহুল্য, খুব কৌতুক অনুভব করলাম।

"হ্যাট পেলেন কোত্থেকে—"

"অনেক আগে স্যুটও পরতাম। সব গেছে ওই হ্যাটটি আছে কেবল।"

আলোবাবুর আরও পরিচয় পেলাম দিন কয়েক পরে। একদিন দেখি তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন।

"কি হল, ছুটছেন কেন—"

"দশটা বেজে গেছে, আমার ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি এখনও। রামবাবুর গাইটার বাচ্ছা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম তাঁর বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। তখুনি ছুটলুম, আমার ঘড়িতে ঠিক দশটার সময় দম দি। আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম, বেচারীর খেতে দেরি হয়ে গেল আজকে—"

তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। আলোবাবুর যে ঘড়ি আছে তা জানতাম না। তাঁর পিছু পিছু এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘরে ঢুকেই তিনি নিজের ভাঙা তোরঙ্গটা খুললেন। তার ভিতর থেকে

বার করলেন একটি ছোট টিনের বাক্স। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়ার ছোট পুঁটুলি-মতন কি বার করলেন। ন্যাকড়াটি খুলতেই লালরঙের শালুর পুঁটুলি বেড়িয়ে পড়ল। সেটি খুললেন। বেরুল রেশমী ন্যাকড়ার পুঁটুলি, সেটি খুলতেই বের হল খানিকটা তুলো, তারপর ছোট্ট ঘড়িটি। তিন পুরু কাপড়-ঢাকা ঘড়িটিকে আঙুরের মতো রাখতেন তিনি সযত্নে। ঘড়িটি বার করে চাপটালি খেয়ে বসলেন, তারপর চোখবুজে ধীরে ধীরে দম দিতে লাগলেন। মনে হল যেন পুজো করছেন।

অবিনাশবাবুর কথাটা মনে পড়ল। স্নেহের কাঙাল বেচারা! জীবনে কিন্তু ভালবাসার সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও। সব স্নেহ তাই উজাড় করে দিয়েছে বোধহয় ঘড়িটির উপর।

একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে দেখি আলোবাবু হ্যাট বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইছেন। দুটো লাইনই বার বার গাইছেন—

আমায় ওরা সইলো না কেউ
আমার কাছে রইলো না কেউ—

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এমন গলা ছেড়ে গান গাইতে শুনি নি কখনও তাঁকে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

"আজ এত জোরে জোরে গান গাইছেন যে।"

"এমনি।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন,

"আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিক সময় হয়তো ভাল করে দম দিতে পারবে না—"

টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আলোবাবু এখন পাগলা গারদে আছেন।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারলেন না কিছুতে।

ধনী-দরিদ্র

"নমস্কার মহেশবাবু, ভালো তো সব?"

দন্তপংক্তি বিকশিত করে ধীরেনবাবু নমস্কার করলেন।

সদ্য পাশকরা কলেজের ছোকরা জীবন কেরানীর ছেলে মহেশ দাসকে নমস্কার করা দূরে থাক গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না আগে ধীরেনবাবু। ইদানীং কিন্তু আনছেন। মানে, আনতে হচ্ছে। ধীরেনবাবুর মনিব রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের একমাত্র কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মহেশ দাসের। বিয়ে যাতে না হয় ধীরেনবাবু গোপনে গোপনে সে-চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ধীরেনবাবুর ইচ্ছে ছিল অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর বিয়ে হোক। অবনীও জমিদারের ছেলে, সুপুরুষ, জয়শ্রীর সঙ্গে ভাবও আছে। কিন্তু হল না। হলে ধীরেন ভাদুড়ীর সুবিধা হত, অবনীকে তিনি প্রাইভেটে পড়িয়েছিলেন কিছু দিন। তাঁর পশার-প্রতিপত্তি বাড়ত। এখন মহেশ দাসকে নমস্কার করতে হচ্ছে। ধীরেনবাবু আর একবার দন্তপংক্তি বিকশিত করলেন।

"মৃণালপুরে যাচ্ছেন না কি? জয়া মা তো সিমলা থেকে নেবে গেছেন, শুনলাম অবনীর কাছ থেকে।"

মহেশ দাসের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হল। জয়শ্রী সিমলা থেকে নেবে মৃণালপুরে গেছে এ কথা শোনা মাত্রই মহেশ সেখানে ছুটবে কেন

বিনা আহ্বানে? ধীরেনবাবুর এই উক্তি তার আত্মসম্মানকে আঘাত করলে যেন। এ কথা ভাববার মানে!

"না, আমার এখন যাবার কোনো ঠিক নেই।"

"ও, আচ্ছা যদি যান আমাকে জানাবেন একটু আগে থাকতে, কিছু ডিম দিয়ে দেব সঙ্গে। আজ অবনীর সঙ্গে দিলাম কিছু, আপনার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে দেব। মৃণালপুরে ডিম পাওয়া যায় না কিনা!"

"অবনীবাবু গেছেন নাকি সেখানে?" প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল মহেশ দাসের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ, বললে, জয়া মা-র চিঠি পেয়েছে কাল। তাকে স্টেশনে তুলে দিয়েই তো আসছি।"

ঘাড়টি কাত করে আর একবার হলদে দাঁতগুলি বার করলেন ধীরেনবাবু, তারপর মরাল-গতিতে মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লাম্বেসো হওয়ার পর থেকে ধীরেনবাবুর মরাল-গতি হয়েছে।

ঘাড় কাত করে সাপ বিষ ঢালে, ধীরেনবাবুও বিষ ঢেলে গেলেন।

অবনী সেন জয়শ্রীর চিঠি পেয়েছে, কিন্তু সে কোনও খবরই জানে না। তার চিঠি পেয়ে অবনী মৃণালপুরে চলে গেল!

নিষ্ঠুর বিষটা মহেশ দাসের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতে লাগল ক্রমশঃ। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল সে অবশেষে কলেজের দিকে।

দুই

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে মহেশ দাস। কিন্তু চমৎকার ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মহেশের বাবা ছিলেন কলেজের কেরানী, অকালে হঠাৎ মারা গেছেন। মহেশ অধ্যাপক হয়েছে সেই কলেজে। মহেশের সুখ্যাতিতে সকলেই পঞ্চমুখ। যেমন বিদ্বান, তেমনি স্বভাব-চরিত্র, তেমনি স্বাস্থ্য। যদিও গরীব, কিন্তু বংশ বনিয়াদী। রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন হাজির হলেন মহেশের মায়ের কাছে। অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল কিছু। অত বড় একজন ধনীর আগমনে মহেশের মা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রায়বাহাদুর যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

"একটি ভিক্ষা আছে আপনার কাছে।"

মহেশের মা মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে নীরব হয়ে রইলেন।

"আপনার মহেশের সঙ্গে জয়ার বিয়ে দিতে চাই। যদি অনুমতি করেন ব্যবস্থা করি। জয়া এবার আই-এ পাশ করল, এইবার বিয়ে দিতে হবে।"

রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্কর তাঁর সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হবেন, এ মহেশের মায়ের কল্পনাতীত ছিল। প্রস্তাব শুনে তিনি খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "আপনার মেয়ের পাত্রের অভাব কি? আমরা গরীব—"

বাধা দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, "অমন ছেলের মা আপনি, আপনি গরীব হতে যাবেন কোন দুঃখে—"

মহেশের মা আবার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, "আচ্ছা, ছেলেকে জিগ্যেস্ করে দেখি।"

মহেশও প্রথমটা রাজী হয় নি।

সে-ও বলেছিল, "মা, ওরা বড়লোক, আমরা গরীব।"

মহেশের মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "বড়লোক হওয়া তো অপরাধ নয় বাবা। হলই বা বড়লোক। নির্মলবাবু লোক খুব ভালো। তা ছাড়া, অত বড় একটা মানী লোক নিজে বাড়িতে এসে অনুরোধ করলেন, মেয়েও শুনেছি খুব ভালো—"

মহেশ চুপ করে রইল। তখন চুপ করে রইল, কিন্তু রাজী হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। নির্মলশঙ্করবাবু নিজে আরও দুবার এলেন, লোক পাঠালেন কয়েক বার। দরিদ্র মহেশের ক্ষুধিত অহঙ্কারটা তৃপ্ত হল বোধহয়, কিংবা হয়তো আরও কিছু···। রাজী হয়ে গেল সে শেষ পর্যন্ত।

সকলেই আশা করেছিল, নির্মলশঙ্করের বন্ধু এবং প্রতিবেশী জমিদার প্রবীর সেনের একমাত্র ছেলে অবনী সেনের সঙ্গেই জয়শ্রীর বিয়ে হবে। অবনীর সঙ্গে জয়শ্রীর খুব মেশামেশি দেখেই লোকে এ কথা ভেবেছিল, কিন্তু ভুল ভেবেছিল।

তারা রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করকে চিনত না। তিনি জহুরী লোক। জমিদারের বিলাসী ছেলে অবনী সেনের তুলনায় বিদ্বান শুভ্রচরিত মহেশ যে কত ভালো তা বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি।

···বিয়ের এই ইতিহাস।

মাত্র মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে।

তিন

সমস্ত দিন নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে রইল মহেশ। তিনটে পর্যন্ত কলেজের ক্লাশ ছিল, তার পর ইচ্ছে করেই সে গিয়ে যোগ দিলে ছেলেদের ডিবেটিং ক্লাবে, সেদিন 'ডিবেট' ছিল একটা, ছেলেদের সঙ্গে টেনিসও খেললে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে পড়াশোনায় মগ্ন রাখবার চেষ্টা করলে নিজেকে, কিন্তু কিছুতেই মন বসল না। ধীরেনবাবুর কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগল।

অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর মাখামাখি সে-ও যে লক্ষ্য করে নি তা নয়। কিন্তু গ্রাহ্য করে নি। সে ভেবেছিল, বড়লোকের মেয়ে বিশেষত আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে—তা ছাড়া, তার নিজেরও এ বিষয়ে যে খুব একটা আপত্তি ছিল তা-ও নয়। মিশলেই বা, ক্ষতি কি তাতে। হারেমের দিন এখন আর নেই। কিন্তু তার প্রতি জয়শ্রীর ব্যবহারটা একটু আড়ষ্ট গোছের হওয়াতে তার কেমন একটু খটকা লাগছিল। একদিনও সে প্রাণখুলে কথা কয় নি তার সঙ্গে, ভালো করে হাসে নি। সে নাকি ভালো গান গাইতে পারে। কিন্তু একদিনও গান গায় নি তার কাছে। সম্মানিত অতিথির প্রতি লোকে যেমন মুখোশ-পরা ভদ্র ব্যবহার করে জয়শ্রীও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করে চলেছে। সর্বদাই কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে তার নিজের আচরণও তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন লেপাফা-দুরস্ত কাণ্ড। মার্বেল পাথরের মেজে, দামী কার্পেট পাতা রয়েছে, পা দিতে

সঙ্কোচ হয়। বহুমূল্য সোফা সেটি। বসতে সাহস হয় না। সব ঝকঝক তকতক করছে। যে দিকে দৃষ্টি ফেরাও কেবল ঐশ্বর্যের চাকচিক্য। মহেশ এক দিনও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারে নি। বাড়ির ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরানী, সোফার-সহিস সব ফিট-ফাট; মিনার্ভা কার, ওয়েলার ঘোড়া, মুলতানী গাই, অ্যালশেশিয়ান কুকুর —মহেশের কেমন যেন ভয়-ভয় করত সর্বদা। বিয়ের পর জামাই হিসেবে যখন সে গেল তখন তাকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো হৈ-হৈ উঠল না। নতুন-কেনা একটা দামী আসবাবের মতোই সে যেন বড়লোকের প্রাসাদে ঢুকল। দামী আসবাবের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেখানো সঙ্গত তার বেশী মনোযোগ যেন কেউ তার প্রতি দিলে না। সে-ও দাবি করতে পারলে না। যত্নের কোনও ত্রুটি হল না অবশ্য। কিন্তু আয়োজনের আধিক্যটাই যেন আঘাত করতে লাগল তাকে। তার মনে হতে লাগল, কারও অন্তরে সে যেন প্রবেশ করতে পারছে না। অনাবশ্যক ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেওয়ালের মতো আড়াল করে ফেলেছে সব কিছুকে।

…রাত্রে ঘুম এল না। কিছুতেই এল না। ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সে। অবনী সেন? কী এমন আছে লোকটার মধ্যে! চেহারা ভালো, ভালো বাঁশীও বাজাতে পারে। তাতে কী! জয়শ্রী অবনীকে খবর দিয়েছে মৃণালপুরে যাবার জন্যে, অথচ তাকে কিছু লেখেনি, এর মানে কী? সে যে সিমলা থেকে চলে এসেছে এ খবরই তো জানে না সে! আশ্চর্য!

জয়শ্রীর চেহারাটা মনের উপর ফুটে উঠল। তার শেষ যে চেহারাটা সে দেখেছিল সেই চেহারাটা। অদ্ভুত রূপসী! ধবধবে

ফরসা রঙ, টকটকে লাল একখানা শাড়ি পরেছিল। কুচকুচে কালো চোখে অদ্ভুত একটা শাণিত দৃষ্টি। লোভনীয়, ভয়ঙ্কর লোভনীয়।

মহেশ দাস শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। তার পর হঠাৎ ঠিক করলে—যাবে। বিনা নিমন্ত্রণেই যাবে। কাউকে কিছু না বলে লুকিয়ে যাবে। হঠাৎ রাত্রিবেলা কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে। দেখতে হবে অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর প্রকৃত সম্পর্কটা কী। যেতেই হবে। ইতিপূর্বে সে মৃণালপুরে যায় নি কখনও। কিন্তু রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের বাড়ি খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। সে যাবে···যেতেই হবে।

চার

রায়বাহাদুর নির্মলশঙ্করের বিরাট বাড়ির সামনে মহেশ এসে যখন দাঁড়াল তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একটানা ডেকে চলেছে পাপিয়াটা—চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের ধারে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহেশ। বাঁশী বাজছে। বাঁশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইছে কে যেন। জয়শ্রী কি? মহেশের একবার ইচ্ছে হল ডাকে। কিন্তু না—সে ডাকবে না। গেটের সামনে এগিয়ে এল আস্তে আস্তে। বিরাট লোহার গেট। নিষ্ঠুর নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে ঠেলে দেখলো একটু। ভিতর থেকে বন্ধ। না, সে ডাকবে না। বাঁশী বেজে চলেছে। সমস্ত অন্তর যেন গলে পড়ছে গানের সুরে সুরে।···

মহেশ ভুলে গেল যে সে একজন অধ্যাপক, ভুলে গেল যে সে এ বাড়ির জামাই। সে ঠিক করলে যে সে গেট টপকে লোহার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠবে লুকিয়ে। আসল ব্যাপারটা কি দেখতেই হবে তাকে। গেটের লোহার গরাদেতে পা রেখে সে উঠতে লাগল।

পাঁচ

সকালে চায়ের আসরে সবাই জমে বসেছে। রেডিওতে বেহালায় ভৈরবী আলাপ করছে কে যেন। হঠাৎ মালীটা এসে বললে, "হুজুর, বাগানে একটা লাস পড়ে আছে। কোনো চোর-টোর হবে বোধ হয়। রাত্রে গেট টপকে ঢুকেছিল, কুকুরে মেরে ফেলেছে—"

জয়শ্রীর দূর-সম্পর্কের একজন মামা বসে ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—"ইস, তাই নাকি? দু-দুটো অ্যালশেশিয়ান এমন ভাবে খুলে রাখিস তোরা। কুকুর তো নয় যেন বাঘ—"

অবনী সেন বললে—"পাহারা দেবার জন্যেই তো কুকুর। চলুন দেখে আসা যাক। এখানকার দারোগা কে আজকাল? পুলিসে একটা খবর দিতে হবে—মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। চল জয়শ্রী, যাবে নাকি—"

"যাচ্ছি দাঁড়ান, ভৈরবীটা শেষ হোক—"

চম্পা

শ্রীমান কার্তিক শ্রীমতী চম্পার প্রেমে পড়িয়াছিল। চম্পা কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, বরং খুশীই হইয়াছিল। কারণ কার্তিক ধনবান তো বটেই, রূপবানও। মিলনের পথে সাধারণত যে সব সামাজিক, আর্থিক বা আধ্যাত্মিক বাধা থাকে এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। চম্পা রূপোপজীবিনী। সরকারের খাতায় নাম লিখাইয়া আইনসঙ্গত উপায়ে সে ব্যবসা ফাঁদিয়াছিল। এরকম ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একদিন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

কার্তিকের প্রতিবেশী অমরবাবুর কলিকাতাস্থ বাসায় একদা প্রভাতে তাঁহার বাল্যবন্ধু যোগেনবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। আসিয়া বলিলেন, "ভাই অমর, এসে তো পড়লুম এবার তুমি সব ব্যবস্থা কর। তোমার পাঁচু স্যাকরাকে এখনই খবর দাও। আমাকে কালই সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরতে হবে। একদিন ছুটি পেয়েছি। বিয়েরও তো দেরি নেই আর। মাঝে মাত্র পনেরোটি দিন।"

অমরবাবু দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "সব হবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন। আগে হাতমুখ ধোও, কিছু খাও, জিরোও, তারপর সব ঠিক করে দেব। আগে গিন্নিকে খবরটা দিয়ে আসি।

অমরবাবু অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। যোগেনবাবু কোটটি খুলিয়া জানালার ধারে যে পেরেকটি ছিল তাহাতে ঝুলাইয়া দিলেন। তাহার পর গেঞ্জি খুলিতে লাগিলেন।

অমরবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি একেবারে ভিতরেই এস। বাথরুমটা খালি আছে এখন, স্নানটা সেরে নাও। স্নান করবে তো?"

"স্নান করবো বইকি"

"তাহলে চলে এস"

"আমি সন্ধ্যাহ্নিকও করব"

"সব ব্যবস্থা আছে, চলে এস"

উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

যোগেনবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন। রাত্রে ট্রেনে একেবারে ঘুম হয় নাই। স্নানান্তে পূজা করিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করেন। পূজার পর চা-জলখাবারের পালা। তাহাতেও খানিকটা সময় গেল। বাল্যবন্ধু যোগেনের জন্য অমরবাবু নানাবিধ আয়োজন করিয়াছিলেন। আহারাদির পর বিবাহের কথা উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরেই অনিবার্যভাবে আর্থিক প্রসঙ্গ লইয়া দুই বন্ধুতে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

যোগেনবাবু বলিলেন, "ভাই ভদ্রাসনটুকু বাঁধা দিয়ে হাজার তিনেক টাকা যোগাড় করেছি। ওইতেই কুলিয়ে নিতে হবে সব—"

"কুলিয়ে যাবে। তবে জিনিসপত্তরগুলো ভালো হবে না। নগদ দিতে হবে না কি কিছু?"

"নগদ দেড়হাজার চেয়েছেন। সেটা বউমার গয়না বিক্রি করে পাব।"

"বউমা তোমার কাছেই আছেন?"

"এখন আছেন। কিন্তু বিয়ের পর ভেবেছি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আমার বাড়িতে দেখা-শোনা করবার কেউ নেই, দিনকালও ভালো নয়। গবুর মা যদি বেঁচে থাকত তাহলে ভাবনা ছিল না—"

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া উঠিল। বছর তিনেক আগে যোগেনবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবর্ধনের বিবাহ দিয়াছিলেন। মাস ছয়েক পরেই গোবর্ধন মারা যায়। তাহার মাস ছয়েক পরেই গোবর্ধনের মা-ও। পুত্রশোক তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

অমরবাবু জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যোগেনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়া উদ্গত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

"গবুর বিয়েতে তুমি তো নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলে। সব টাকাটা খরচ করে ফেলেছ?"

"বাড়িটা দোতলা করলাম যে। গবুর জন্যেই দোতলা করাতে হয়েছিল। এখন সব শূন্য পড়ে আছে। যাক, ভাগ্যে বাড়িটা ছিল তাই সেটা বাঁধা দিয়ে বিয়ের টাকাটা যোগাড় হল—"

"বাড়ি বাঁধা দিয়ে মোটে তিন হাজার টাকা পেলে?"

"তাই দিতে চায় না হে। গরজ যে আমার। এদিকে মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে, সুপাত্র যখন পেয়েছি তখন আর দ্বিমত করলাম না। কিছুদিন পরে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডটা পাব, তাই দিয়ে উদ্ধার করব বাড়িটা। আর কার জন্যেই বা বাড়ি, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বাড়িতে কে থাকবে বল—"

"তা বটে—। পাত্রটি কি করে ?"

"এবার বি. এ. পাশ করেছে। আগে বার দুই ফেল করেছিল। তবে বংশ ভালো। ঘরে খাওয়া-পরার সংস্থান আছে, দেশে বাড়ি আছে—"

"এই পাত্র নগদ পণ দেড় হাজার চাইছে ?"

"আর, বল কেন ভাই। আমি আর দরদস্তুর করি নি, বুঝলে ! মেয়ে পছন্দ হতেই ওরা যা বললে তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। গত দু-বৎসর থেকে ক্রমাগত মেয়ে দেখাচ্ছি, কারও পছন্দই হয় না—ওর সামনের দাঁতগুলো উঁচু কি না—"

বলিয়াই যোগেনবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তিনিও গবুর জন্য অনেক মেয়ে দেখিয়াছিলেন, অনেককে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছিলেন। একটি মেয়েকে তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বাবা নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন নাই। আর একটি মেয়ে······

"পাঁচু স্যাকরাকে ডাকতে পাঠাই তাহলে। ডাকবার দরকার কী নিজেরাই যাই চল। ট্রামে পাঁচ মিনিট লাগবে।"

দুইজনেই বৈঠকখানায় বাহির হইয়া আসিলেন।

"এ কী, আমার কোটটা কোথা গেল। এইখানে টাঙিয়ে রেখেছিলাম যে—"

"কোনখানে—"

"এই পেরেকে—"

"তাহলে ঠিক কেউ জানলা দিয়ে নিয়ে গেছে। ওখানে কোট রাখতে গেলে কেন—"

"ওই কোটের পকেটেই যে তিন হাজার টাকা আছে আমার।"

"অ্যাঁ, বল কী !—"

যোগেনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ব্যাপারটা পাড়ায় চাউর হইয়া গেল।

অমরবাবু নিজের এবং পাশের বাড়ির চাকরদের ডাকিয়া জেরা করিতে লাগিলেন, পুলিসের ভয় দেখাইলেন। যদি খুঁজিয়া দিতে পারে বকশিশ দিবেন এ কথাও বলিলেন। কিন্তু ফল হইল না।

অবশেষে একটা চাকর বলিল, "কার্তিকবাবুকে বলুন, তাঁর হাতে অনেক গুণ্ডা আছে তিনি যদি চেষ্টা করেন হয়তো কোনও পাত্তা লাগাতে পারেন।"

কার্তিকের পিতা বিশ্বেশ্বরবাবুর সহিত অমরবাবুর হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি মারা গিয়াছেন। কার্তিকও তাঁহাকে চেনে, খাতিরও করে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে সব কানাঘুষা বাজারে শোনা যাইতেছে তাহাতে তাহার নিকট যাইতে অমরবাবুর প্রবৃত্তি হয় না। বন্ধুর খাতিরে তবু গেলেন। সমস্ত শুনিয়া কার্তিক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমি চেষ্টা করে দেখছি, যদি কিছু করতে পারি। যদি কিছু করা সম্ভব হয় আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আপনার কাছে যাব। আর যদি না যাই তাহলে জানবেন কিছু করতে পারি নি।"

অমরবাবু চলিয়া আসিলেন।

কার্তিকও মোটরটি বাহির করিল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই চম্পার বাড়িতে পৌঁছিয়া গেল।

চম্পা বিস্মিত হইল একটু। এ সময়ে কার্তিক সাধারণত আসে না।

"আজ এমন অসময়ে যে"

"একটু দরকার আছে। একটা কথা শুনেছিলাম কিন্তু সে কথা তোমাকে জিগ্যেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার গুণ্ডারা তোমাকে নাকি 'রানী' করেছে ?"

মুচকি হাসিয়া চম্পা বলিল, "হ্যাঁ করেছে—। আমি ত্রিশ ভোটে জিতেছি। ফুলী আমার সঙ্গে কনটেস্ট করেছিল, পারে নি।"

"ভোট নিয়ে ঠিক হয় নাকি এসব ?"

"নিশ্চয় !"

"রানীর ক্ষমতা কী ?"

"ঠিক রানীর মতোই ক্ষমতা। ওদের আমি যা করতে বলব তা ওরা তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে করবে। কেন, দরকার আছে নাকি কিছু ?"

"আছে—"

কার্তিক সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

"চোর পকেটমার এদের উপরও তোমার কর্তৃত্ব আছে না কি ?"

"আছে বই কী। এ বছরকার মতো কলকাতার আণ্ডার ওয়ার্লডের রানী আমি। বাংলা ভাষায় পাতালের রানী বলতে পার—"

"দেখ যদি ভদ্রলোককে সাহায্য করতে পার। বড়ই বিপন্ন হয়েছেন। ধার করে মেয়ের বিয়ের বাজার করবার জন্যে যে টাকা এনেছিলেন তা সব ছিল ওই কোটের পকেটে—

"দেখি—"

ইলেকট্রিক বেল টিপিতেই দৈত্যের মতো বিরাটকায় একটি লোক অভিবাদন করিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল।

"দেখ, মুনিম কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে একটি কোট চুরি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কে সেখানে ডিউটিতে ছিল ?"

"সুখন"

"তাকে ডাক"

আধ ঘণ্টা পরে সুখন আসিয়া হাজির হইল। অতিশয় নিরীহ ভদ্র চেহারা। কে বলিবে লোকটা চোর।

"সুখন, আজ সকালে কৈলাস বসু স্ট্রীট থেকে কোট পেয়েছ কি একটা ?"

"হাঁ মাইজি। জানলার ধারে ঝুলছিল, গলি থেকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছি।"

"কোটটা ফেরত দিতে হবে।"

"সেটা তো গুদামে জমা হয়ে গেছে মা।"

চম্পা কার্তিকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি কোটটা চেন কি ?"

"না—"

"সেই ভদ্রলোককে নিয়ে এস এখানে, আমি কোটটা এখানে আনিয়ে রাখছি।"

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে।

কার্তিক ও যোগেনবাবু চম্পার বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সুসজ্জিত ঘর। মেজেতে দামী কার্পেট পাতা। চলিতে গেলে পা ডুবিয়া যায়। প্রত্যেকটি আসবাবই দামী। পরদা ঠেলিয়া চম্পা প্রবেশ করিল।

"এই কোটটা কি আপনার ?"

চম্পাকে দেখিয়া যোগেনবাবু একটু চমকাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ, এইটেই—"

"দেখুন এতে যা যা ছিল তা ঠিক আছে কি না।"

যোগেনবাবু দেখিলেন সবই ঠিক আছে। ইনার পকেটে নোটের তাড়াটা যেমন পিন করা ছিল তেমনি রহিয়াছে। একটা পকেটে বিড়ি দেয়াশালাই ছিল তাহাও আছে।

যোগেনবাবুর মনে হইল এ মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল।

"তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে ?"

"না, কোথাও দেখেন নি।"

"আচ্ছা তোমার নামটি কি সাবিত্রী ?"

"না, আমার নাম চম্পা।"

চম্পা আর দাঁড়াইল না, ভিতরে চলিয়া গেল।

যোগেনবাবুর কিন্তু ভুল হয় নাই। গবুর বিবাহের জন্য যখন তিনি একের পর এক পাত্রী দেখিতেছিলেন তখন তাহাদের মধ্যে এ মেয়েটিকেও দেখিয়াছিলেন। মেয়েটির রূপ দেখিয়া এবং তাহার 'সাবিত্রী' নাম শুনিয়া ইহাকে তাঁহার পছন্দও হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বাবা নিতান্ত গরীব ছিল, পাঁচ হাজার টাকা পণ শুনিয়া পিছাইয়া যায়।

যোগেনবাবু হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

"চলুন, কোট তো পেয়ে গেলেন—"

আসিবার সময় আবার নরম কার্পেটে তাঁহার পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

রঘুবীর রাউত

জমিদারি-প্রথা তখনও অবলুপ্ত হয় নি। মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রঘুবীর রাউতের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। মহারান ভিক্টোরিয়ার আমল তখন, ইংরেজের কড়া আইন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু রঘুবীর রাউত নিজের আইনে চলেন। সে আইনের সংগে ইংরেজের আইনের গরমিল হলেও চিন্তিত হন না তিনি। টাকার জোরে সব ঠিক হয়ে যায়। তা বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। বরং সুবিচার করবার জন্যেই তিনি প্রচলিত আইন অমান্য করতেন। তিনি ব্যাপারটার মর্মস্থলে একেবারে তীরের মত সোজা সবেগে পৌঁছে যেতেন। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

এক ছোকরা দারোগা এসে তাঁর জমিদারিতে উৎপাত করতে লাগল একবার। লোকের খাসিটা-পাঁটাটা নিয়ে যায়, দাম দেয় না। ঘুস খেয়ে আসল অপরাধীকে ছেড়ে দেয়, নিরপরাধ গরিবকে নিয়ে টানাটানি করে। রাউত মশায়ের গুপ্তচর (লোকে গোপনে তাকে মাহুত বলত) মুলুক দাস এসে খবরটি রাউত মশায়ের কর্ণগোচর করল। রাউত মশায় ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "সাবধান করে দাও ওকে। পুলিসের লোক, হট করে ঘাঁটাতে চাই না; কিন্তু বেশি যদি বাড়াবাড়ি করে, শিক্ষা দিয়ে দেব।"

সপ্তাহ-খানেক পরে মুলুক দাস এসে বলল, "সাংঘাতিক লোক ব্যাটা। আমাদের হীরু গোয়ালার মেয়েটাকে নিয়ে টানাটানি করেছে রাত্রে। সবাই হৈ-হৈ করে উঠতেই বাইকে চড়ে পালাল। আজ সকালে আমি থানায় গিয়েছিলাম। আড়ালে ডেকে বললাম আপনার কথা। জবাবে কী বললে জানেন, বললে, 'আমি স্বয়ং কুইনের প্রতিনিধি, আর উনি একটা সামান্য জমিদার। যদি ইচ্ছে করি ছারপোকার মত পিষে মেরে ফেলতে পারি ওঁকে। ওঁকে মানা করে দেবেন, উনি যেন আমার ব্যাপারে হাত না দেন। আমি ওঁর প্রজাও নই, খাতকও নই।'"

রাউত মশায় কিছু বললেন না। বাঁ হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বাঁ দিকের গোঁফটায় তা দিতে লাগলেন খালি। বাঁ দিকের গোঁফটার উপর তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সাতদিন পরে রাউত মশায় বৈঠকখানায় বসে আছেন, দেখতে পেলেন দারোগাটা তাঁর গেটের সামনে দিয়ে বাইকে করে যাচ্ছে।

"রাবণ মিশির—"

"জী হুজুর!"

বলিষ্ঠ সিপাহী রাবণ মিশ্র সেলাম করে দাঁড়াল।

"দারোগা সাহেব বাইকে করে যাচ্ছে, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো। যদি আসতে না চায়, ধরে নিয়ে এসো।"

"যো হুকুম।"

মিনিট দশেক পরে ক্রুদ্ধ দারোগাকে টানতে টানতে নিয়ে এল রাবণ মিশির।

"থামের সঙ্গে বেশ কস্‌কসিয়ে বাঁধো ওকে। আগে প্যাণ্ট কোট গেঞ্জি সব খুলে নাও, যদি চেঁচায়, মুখটাও বেঁধে ফেলো।"

রাবণ মিশির তাকে টানতে টানতে নির্জন পশ্চিম বারান্দায় নিয়ে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল, দারোগাকে থামে বাঁধা হয়েছে। রাউত মশায় উঠে গিয়ে দেখলেন, উলঙ্গ আবদ্ধ দারোগা নির্বাক হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তার চোখ দুটো দিয়ে আগুনের হলকা ফুটে বেরুচ্ছে।

রাউত বললেন, "আপনি মহারানীর প্রতিনিধি, আমি আমার প্রজাদের প্রতিনিধি। আপনি যেসব অন্যায় করেছেন তার শাস্তি দিচ্ছি। আজ আপনাকে চাবকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ফের যদি এসব করেন তাহলে বাঘ কিংবা কুমির দিয়ে আপনাকে খাওয়াব। ও দুটো জানোয়ারই আমি পুষি, আশা করি জানা আছে সেটা আপনার। এই, বেত লাগাও—"

রাবণ মিশির একটা হাণ্টার বের করে এনে চাবকাতে লাগল দারোগাকে। রঘুবীর রাউত একটা মোড়ায় বসে বাঁ দিকের গোঁফটি চোমরাতে লাগলেন। একটু পরে দারোগা অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন রাউত মশায় হুকুম দিলেন, "ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হীরু গোয়ালার বাড়ির পিছন দিকের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আয়। তারপর এই টেলিগ্রামটা ডাকঘরে নিয়ে যা। আমি টেলিগ্রাম লিখছি, ওটাকে ফেলে দিয়ে আয় আগে।"

টেলিগ্রাম করলেন পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে। লিখলেন, "এখানকার দারোগা একটি গোয়ালার মেয়েকে বলাৎকার করছিল বলে গুরুতররূপে প্রহৃত হয়েছে। অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন।"

অনেক হাঙ্গামা হুজ্জত হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি গেল দারোগাটার। রঘুবীর রাউত ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী

ছিলেন। যা করতেন নিজেই করতেন। আবেদন-নিবেদন বা আইনের ঘোরপ্যাঁচের ভিতর যেতে চাইতেন না। বলতেন, "আইন? ও আইন অনুসারে চললে দোষীকে সাজা দেওয়া যায় কখনও? হাতে-নাতে চোর ধরলেও মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করতে হবে, তা না করলে চোর ছাড়া পেয়ে যাবে!" আদালতে তাঁর মামলা-মকদ্দমা হরদম লেগে থাকত। কিন্তু তিনি একবার ছাড়া কখনও ফরিয়াদী হন নি। বরাবর আসামী হয়েছেন। তিনি নিজের জমিদারিতে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন সুতরাং আইন ভঙ্গের অপরাধে আসামী হতে হত তাঁকে।

যে-মকদ্দমায় তিনি ফরিয়াদী হয়েছিলেন তারই গল্প এবার বলব।

দুই

রঘুবীররা দুই ভাই ছিলেন, রঘুবীর আর সুমিত্রানন্দন। সুমিত্রানন্দন এবং তাঁর পত্নী বহুকাল আগে মারা গেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অযোধ্যাপ্রসাদ রঘুবীরের কাছে মানুষ হচ্ছিল। রঘুবীর অপুত্রক এবং বিপত্নীক। সুতরাং অযোধ্যাপ্রসাদ রাউতই বিশাল জমিদারির একমাত্র উত্তরাধিকারী। রঘুবীর অযোধ্যাপ্রসাদকে লেখাপড়া শেখান নি বিশেষ। স্কুল কলেজের শিক্ষার উপর তেমন আস্থা ছিল না তাঁর। তিনি তাকে মোটামুটি বাংলা ইংরেজী এবং অঙ্ক শিখিয়েছিলেন। পালোয়ান রেখে কুস্তি করতে শিখিয়েছিলেন। গান বাজনা শেখাবার জন্যে ওস্তাদ রেখেছিলেন একজন। অযোধ্যাপ্রসাদ যখন সাবালক হল তখন তাকে আলাদা বাড়িও

করিয়ে দিলেন একটি। জমিদারীর একটা মহালের ভারও দিয়ে দিলেন যাতে সে স্বাধীনভাবে থেকে জমিদারি পরিচালনা করবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ—চাণক্যের এই উপদেশ রঘুবীর মানতেন। প্রাপ্তবয়স্ক অযোধ্যাপ্রসাদের কোনও কাজে বাধা দিলেন না তিনি।

ফল নিম্নলিখিত প্রকার হল।

যে পালোয়ানেরা তাকে কুস্তি শেখাতে এসেছিল তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরামর্শ দিলে যে, পুষ্টিকর খাবার প্রচুর পরিমাণে না খেলে কুস্তিতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট, খুবানি খোয়া প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। এর সঙ্গে মাছ মাংস ডিম থাকলে আরও ভাল হয়। গামা, গোবর, কিক্কর প্রভৃতি বড় বড় ব্যায়ামবীরদের খাদ্য-তালিকা আউড়ে তারা অযোধ্যাপ্রসাদকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলে যে, কুস্তি করতে হলে ভাল খাওয়া চাই।

অযোধ্যাপ্রসাদের অর্থাভাব ছিল না। বাদাম পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর আনিয়ে ফেললে। মুশকিল হল মাছ-মাংস নিয়ে। পাড়াগাঁয়ে প্রত্যহ ভালো মাছ-মাংস পাওয়া যায় না। অযোধ্যাপ্রসাদ প্রত্যহ কালীপূজার ব্যবস্থা করে ফেললে। রোজ পাঁঠা কাটা হতে লাগল। তার মহালে বড় দিঘি ছিল একটা। সেখানে সে আর তাঁর পালোয়ানরা রোজ ছিপ ফেলে বসতে শুরু করল। জেলেরা জাল নিয়ে নিয়ে ঘুরতে লাগল। অন্তত সের পাঁচেক মাছ রোজ চাই। কারণ সে একা তো নয়, গোটা পাঁচেক পালোয়ান আছে। মাছও জুটতে লাগল। পয়সা খরচ করলে সবই হয়।

গান-বাজনায় ওস্তাদ নুর মহম্মদও একটি পরামর্শ দিলেন তাকে।

বললেন, সেতার যখন বাজে তখন একটি অদৃশ্য নর্তকী সেতারের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে। তার নূপুরের নিক্কণ হুজুর নিশ্চয়ই শুনেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সতরঞ্চের উপর যদি আর একটি নর্তকী নাচে তাহলেই জুড়ি ঠিক মেলে আর তাহলেই সেতারের মজাটা পুরো পাওয়া যায়। নুর মহম্মদ অযোধ্যাপ্রসাদের বাড়ির পাশেই একটি আলাদা বাড়িতে থাকতেন। বললেন, লখ্নৌ থেকে তার বিবির এক বোন এসেছে। সাবিত্রী দেবী নাম নিয়ে সে সিনেমায় নামতে চায়। কিন্তু হুজুর যদি মত দেন—।

বাঁ দিকের গোঁফ মোচরাতে মোচরাতে মুলুক দাসের কাছে খবর শুনছিলেন রাউত মশায়।

মুলুক দাস বলছিল, "বেলা নটা দশটার সময় ওঠে অযোধ্যা আজকাল। উঠে মুখ ধোয় ঘণ্টাখানেক ধরে। তারপর চা খায়, তারপর বাদাম পেস্তার হালুয়া। যা চেহারা হয়েছে, চিনতে পারবেন না আপনি। এই টেবো-টেবো গাল, থলথলে ভুঁড়ি, গর্দানের উপরও চাপ-চাপ চর্বি। প্রকাণ্ড একটা গড়গড়া কিনেছে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক ধরে তামাকই খায়। তারপর তেল মাখতে বসে। ওই পালোয়ানগুলো তেল মাখায় ওকে। বলে না কি মাসাজ করলে শরীরের উপকার হবে। প্রথমে সর্ষের তেল, পরে অলিভ অয়েল, তারপর মাথায় ফুলেল তেল। খেতে বসে দুটো আড়াইটের সময়। মাছ মাংস রাবড়ি রোজ খায়। নানারকম তরিতরকারি খাবার জন্যে বাড়ির পিছনে বিঘে দুই জমিতে শাকসবজি লাগিয়েছে। হাঁস পুষছে। রোজ ডিম খায়। খেয়ে-দেয়ে শোয় একটু। তারপর বিকেলে গিয়ে দিঘিতে মাছ ধরতে বসে। পালোয়ানগুলোও বসে। সন্ধ্যের পর থেকে আরম্ভ হয় গানের মজলিস। সাবিত্রী দেবী

নাচেন। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গান-বাজনা চলে। আজকাল মদও চলছে শুনছি।"

"চুপ কর, বুঝেছি।"

থেমে গেল মুলুক দাস। তারপর আড়চোখে তাঁর দিকে একবার চেয়ে উঠে গেল। রাউত মশায় আরও খানিকক্ষণ গোঁফ চোমরালেন, তারপর তিনিও উঠে গেলেন।

তিন

এর পরই শুরু হল মকদ্দমা।

রঘুবীর রাউত এক জাল দলিল বার করে দাবি করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে সুমিত্রানন্দন তাঁর অংশের সম্পত্তি তাঁকে (অর্থাৎ রঘুবীরকে) বিক্রি করে গিয়েছিলেন। জমিদারিতে আইনত অযোধ্যাপ্রসাদের কিছুমাত্র অধিকার নেই। কিন্তু সে জোর করে একটা মহাল দখল করে বসে আছে এবং অপব্যয় করে সম্পত্তি নষ্ট করেছে। আদালত থেকে তাঁকে তাঁর ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করবার অনুমতি দেওয়া হক।

দ্বিতীয় মকদ্দমা করল নর্তকী সাবিত্রী দেবী। তাকে টাকা দিয়ে হাত করলেন রাউত মশাই এবং তাকে দিয়েই এক মকদ্দমা রুজু করা গেল। সাবিত্রী দেবী আদালতে হলফ করে বলে এল যে, অযোধ্যাপ্রসাদ তার উপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার, উকিল এবং আরও জনকয়েক প্রত্যক্ষদর্শী সমর্থন করলেন সাবিত্রী দেবীকে।

তৃতীয় মকদ্দমা করলে কয়েকটি প্রজা। তাদের নালিশ অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি জোর করে তাদের কাছে খাজনা আদায় করেছে। মারধোরও করেছে।

চতুর্থ মকদ্দমা করলে পিয়ারিলাল ঢনঢনিয়া। অযোধ্যাপ্রসাদ নাকি তাঁর মানহানি করেছে। এইভাবে নানা ছুতোঁয় দশটা মকদ্দমা লাগিয়ে দিলেন রাউত মশাই অযোধ্যাপ্রসাদের বিরুদ্ধে।

ঘুমন্ত লোকের মাথায় যদি বাড়ির ছাত ভেঙে পড়ে, তাহলে তার যা অবস্থা হয় অযোধ্যাপ্রসাদের তাই হল।

সে প্রথমটা ভাবলে যে, জ্যেঠামশাইয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এ-ভুল ভাঙতে দেরি হল না। মুলুক দাসই এ-ভুল ভাঙিয়ে দিলে। সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, রঘুবীর বলে পাঠালেন তিনি তার মুখদর্শন করতে অনিচ্ছুক।

অযোধ্যাপ্রসাদের শ্বশুর শাঁসালো ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হল তাকে। সে মকদ্দমা লড়তে লাগল।

বছর দুই কেটে গেছে।

কয়েকটা মকদ্দমা জিতেছে অযোধ্যাপ্রসাদ। কিন্তু আসল মকদ্দমাটা অর্থাৎ বিষয়ের মালিকানা-স্বত্ব নিয়ে যে মকদ্দমাটা হচ্ছিল সেটা শেষ হয় নি। লোয়ার কোর্টে হেরে গেছে অযোধ্যাপ্রসাদ, হাইকোর্টে আপিল করেছে।

মুলুক দাস রঘুবীর রাউতকে একটি খবর দিলে।

"অযোধ্যাপ্রসাদ দেখলাম খুব রোগা হয়ে গেছে। দেহের চর্বি বিলকুল ঝরে গেছে। মুখ শুকনো চুল উসকো-খুসকো—"

রাউত গোঁফ চোমরাতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

হাইকোর্টে রাউত হারলেন। কিন্তু তিনি ছাড়বার লোক নন, বিলেতে আপিল করলেন আবার। বিলেতের আপিলে জিতে গেলেন তিনি।

তারপর ডেকে পাঠালেন তিনি অযোধ্যাপ্রসাদকে। অযোধ্যা-প্রসাদ নতমস্তকে এসে দাঁড়াল।

"এই নাও—"

একটা খাম এগিয়ে দিলেন তার দিকে।

"কী এটা?"

"ডীড অব গিফট। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দান করলাম।"

অযোধ্যাপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। একটু ইতস্তত করে মাথা চুলকে তারপরে বলল, "তাহলে মকদ্দমা করবার দরকার কী ছিল।"

"তোমার বড্ড চর্বি হয়েছিল, সেটা একটু ঝরিয়ে দিলাম। বিষয় সম্পত্তি কী করে রক্ষা করতে হয় তারও একটু ট্রেনিং হয়ে গেল তোমার। বিপদে না পড়লে তো শিক্ষা হয় না। তুমি যে-রাস্তায় চলেছিলে তাতে আমাদের পিতৃপুরুষের বিষয়সম্পত্তি ডুবে যেত। আমি কাল কাশী যাব, আর ফিরব না। কাল থেকে তোমাকেই স্টেটের ভার নিতে হবে। যাও—"

অযোধ্যাপ্রসাদ প্রণাম করে চলে গেল।

কলার বিবর্তন

তখন সাহেবেরা এদেশে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন। সাধারণ লোকে সাহেবদেরই দেবতা বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা কিছু ভালো তাহাই বিলাতী বিশেষণে ভূষিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতাই যে আমাদের দেশকে ত্রাণ করিবে এ বিশ্বাস শিক্ষিত সমাজেরও মনে শিকড় গাড়িয়াছে, অশিক্ষিত চাষাদের তো কথাই নাই। রেলগাড়ি দেখিয়াই তাহারা বুঝিয়াছে যে বিলাতী দেবতারা অসাধ্য সাধন করিবে।

হারাধন সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিত। রেলগাড়ি চড়িবার জন্যই সে একদিন গ্রাম হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল। বলাবাহুল্য, সঙ্গে কিছু পয়সা-কড়িও লইল। সে জানিত বিনা পয়সায় কিছু হয় না। এ গোরুর গাড়ি নয় যে গাড়োয়ানকে অনুরোধ করিলে কিছুদূর চড়াইয়া লইয়া যাইবে। বিলাতী কলের গাড়ি, টিকিট কাটিয়া চড়িতে হয়। তাছাড়া শহরে যাইতেছে কিছু ভালো বিলাতী জিনিস পাইলে কিনিয়া আনিবে। সুতরাং কিছু টাকা-পয়সাও সে সঙ্গে লইল।

অনেক দূর হাঁটিয়া বর্ধমান স্টেশনে সে আসিয়া প্রথম ট্রেনে চাপিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়া গেল।

অবাক কাণ্ড, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কলিকাতা। গোরুর গাড়িতে আসিলে কয়দিন লাগিত ঠিক কি!

কলিকাতার জনারণ্যে কিছুক্ষণ দিশাহারা হইয়া ঘুরিবার পর তাহার হুঁস হইল যে পথ হারাইয়া গিয়াছে। বাড়ি ফেরা যাইবে না। ব্যাকুল হইয়া আরও কিছুক্ষণ ঘুরিল, কিন্তু তাহাতেও সুবিধা হইল না। অবশেষে হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল বেচারা।

"কি রে কাঁদছিস কেন, কে তুই—"

"আমি হারাধন। পথ হারিয়ে ফেলেছি—"

"কোথা যাবি—"

"হাওড়া"

"চল আমিও হাওড়া যাব। গাছ কটা বেচে ফেলি। আয় আমার সঙ্গে"

একটি গলির ভিতর দিয়া হারাধন একটা তরকারির বাজারে আসিয়া হাজির হইল। যে লোকটি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল সত্যই তাহার কয়েকটি গাছ ছিল একটা ঝুড়িতে। হারাধন যদিও চাষা তবু ওগুলা কি গাছ তাহা চিনিতে পারিল না।

জিজ্ঞাসা করিল, "কলাগাছের মতো পাতা, 'ওগুলো কি গাছ?"

হারাধন যে কি জাতীয় খাজা তাহা কলিকাতাবাসী শ্যামচাঁদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "কলাগাছই। বিলিতি কলা—"

"বিলিতি কলা! আমিই তাহলে কিনে নিই। কত দাম—"

"পাঁচটি আছে, পাঁচ টাকা পড়বে—"

"কিছু কম হবে না?"

হারাধন গোটা দশেক টাকা লইয়া বাড়ি হইতে বাহির

হইয়াছিল। ওই টাকা কয়টা জমাইতে তাহার এক বৎসর লাগিয়াছিল। তখন পাঁচ টাকায় একটা ছোটখাটো গোরু পাওয়া যাইত। পাঁচটা কলার চারা পাঁচ টাকা দিয়া কিনিবে কি না হারাধন একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

"নিবি তো নিয়ে নে। আমিও ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাই, তোকে হাওড়ায় পৌঁছে দি। এরকম জিনিস সহজে কোথাও পাবি না। আদত বিলিতি কলা—"

হারাধন চারাগুলি কিনিয়া ফেলিল।

"খুব ভালো গোবরের সার দিতে হবে"

"তা আমি খুব পারব"

বাড়ি ফিরিয়া খুব যত্ন করিয়াই সে বিলাতী কলার চারাগুলি পুঁতিল।

দুই

মাস ছয় কাটিয়াছে। গাছগুলি বড় হইয়াছে। কিন্তু কলা একটিও হয় নাই। মোচার মতো হয়, কিন্তু তাহা হইতে কলার কাঁদি বাহির হয় না, ফুল হইয়া যায়। কোনোটা লাল ফুল, কোনোটা হলদে। হারাধন আবার ভাল করিয়া গোবর দিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। ক্রমাগত ফুল হইতে লাগিল। কলা কই?

চটিয়া-মটিয়া আবার একদিন সে কলিকাতার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। এবার আর তাহার রাস্তা ভুল হইল না। সোজা সে সেই তরকারির বাজারে হাজির হইল আবার। সন্দেহ ছিল

শ্যামচাঁদের দেখা পাইবে কি না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শ্যামচাঁদ ছিল। অন্য ফুলের চারা বেচিতেছিল সে।

"এই যে! আচ্ছা সেবার তুমি যে আমাকে পাঁচ টাকার পাঁচটা বিলিতি কলার গাছ বেচলে, কিন্তু এক কাঁদি কলাও তো নামল না!"

শ্যামচাঁদ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া রহিল, তাহার পর মনে পড়িল তাহার।

"কিছুই হয় নি?"

"খালি ফুল হচ্ছে। নানা রঙের ফুল—"

"তাই তো হবে। বিলিতি কলা যে—"

"কি রকম—"

"ওতে খাবার কলা হয় না। দেখবার কলা হয়"

"কিন্তু দিব্যি করে বলছি একটি কলাও দেখি নি"

"কিন্তু এখনি নিজের মুখে বললে ফুল হচ্ছে"

"তা হচ্ছে তো—"

"ওই ফুলই কলা। সাহেবরা বলে আর্ট, বাংলায় ওকেও কলা বলে"

"কি রকম"

"ওই রকম। যাও, মেলা বক্‌বক্ করে আমার সময় নষ্ট কোরো না। বিলিতি কলাগাছে মর্তমান কলা ফলবে কি করে। কি আপদ।"

হারাধন খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল তাহার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বহুকাল পরে সাহেব-বাড়ির এক মালী তাহাকে আর একটু জ্ঞানদান করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওর বিলিতি নাম ক্যানা—".

তিন

বিখ্যাত পুষ্পবিক্রেতা নগেন্দ্র নাথ এণ্ড কোং-এর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। ক্যানা ফুল বিক্রয় করিয়াই তিনি মাসে হাজার টাকা রোজকার করেন। তাঁহার ক্যানা না কি ভারতবর্ষের বাহিরেও যায়। হারাধন ছিলেন নগেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ। নগেন্দ্রনাথ আর একটি জিনিসও করিয়াছেন। এক রকম এসেন্স বাহির করিয়াছেন যাহার গন্ধ ঠিক কলার মতো। জিনিসটা ঘোলের শরবতে খুব চলে।

চার

নগেন্দ্রনাথের পুত্র স্মরজিৎ নূতন পথ ধরিয়াছে।

সে একজন অতি-আধুনিক কবি। বাজারে বেশ নাম হইয়াছে।

শ্রীনাথ সেনের 'তুমি'

শ্রীনাথ সেন কবি ছিলেন বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, তিনি একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ জানে না, জানবেও না, কারণ তিনি তাঁর একটি লেখাও ছাপান নি। তাঁর কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তাঁর পরিচয়ও কেউ জানে না। তিনি নির্জন বনে ফুটে নির্জনেই ঝঁরে গেলেন। নির্জন বনেও দুচারটি পুষ্পরসিক অলি আসে, সেই ভাবেই তাঁরও দুচারজন সমঝদার বন্ধু জুটেছিল। যাঁরা ইংরেজি ভাষা জানেন না, তাঁদের পক্ষে তাঁর কবিতার রস-গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কারণ অধিকাংশ কবিতাই তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সংস্কৃতেও দুচারটে লিখেছিলেন, কিন্তু তার সংখ্যা খুব অল্প।

তাঁর ইংরেজি কবিতার দুচারটে অনুবাদ নীচে দিচ্ছি, মূলের সঙ্গে অবশ্য অনুবাদের আকাশ-পাতাল তফাত, তবু দিচ্ছি, কারণ তাহলে লোকটাকে বোঝা সহজ হবে। একটা কবিতায় লিখেছেন—

"তুমি এসেছ, কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। আমার শাখা শোভিত হয়েছে তোমার আগমনে স্বীকার করছি, কিন্তু এ-ও আমি বলব, তুমি এসেছ কারণ তোমাকে আসতে হয়েছে। রাত্রির পর দিন যেমন আসে, অমাবস্যার পর দেখা দেয় যেমন শিশুচাঁদ পূর্ণিমার সম্ভাবনা নিয়ে, তেমনি তুমি এসেছ। তোমাকে আসতে হয়েছে।

আমার জীবনে তোমার আগমন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তাই এসেছ। তোমাকে অভ্যর্থনা করি তবু"। আর একটা কবিতায় বলছেন—"আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ। আমার স্থূল অঙ্গুলি স্পর্শে ও-সুর বাজত না। আমার স্থূল অঙ্গুলি তবু বার বার তোমাকে বাজাতে চেষ্টা করেছে, বাধা দিয়েছে তোমার স্বতোৎসারিত সুর-লীলায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি প্রতিষ্ঠিত করেছ নিজের মহিমা। তোমার স্বর্গীয় সুরসাধনা উপভোগ করেছে অসংখ্য নক্ষত্র নিশীথ সভায় বসে, আমিও করেছি। কিন্তু আমি দিনেও তোমার গান শুনেছি। ভিড়েও শুনেছি, একাও শুনেছি। তাই বার বার অনুভব করেছি আমি তোমাকে বাজাই নি, তুমি নিজেই বেজেছ…"

আর একটি কবিতায় বলেছেন, "রক্তের সমুদ্র থেকে প্রতি প্রভাতে তোমার জন্ম হয়; ঊর্বশীর মতো নয়, মৃত্যুর মতো। জীবনের ছদ্ম-বেশে আলোকের ছলনায় সমস্ত দিন ভোলাও তুমি আমাকে, আমিও ভুলি কারণ আমি ভুলতে চাই। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে আবার রক্তের সমুদ্র থইথই করে পশ্চিম দিগন্তে, আকাশের নীলের সঙ্গে, রাত্রির কালোর সঙ্গে মেশে রক্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ-নর্তন। তাতে ঝাঁপ দাও তুমি। তোমার মেখলার মুক্তারা ছড়িয়ে পড়ে নক্ষত্রের মতো…"

চতুর্থ যে কবিতাটির অনুবাদ দিচ্ছি সেটি আমিও ভালো বুঝি নি। কিন্তু আমার মনে হয়, এরই মধ্যে তাঁর মৃত্যু-রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

"অন্ত সরে সরে যাচ্ছে আদির কাছ থেকে। কে যেন তাকে সরিয়ে দিচ্ছে জোর করে, হয়তো সময়ের স্রোত-বেগে অসহায়ের মতো ভেসে চলেছে। কিন্তু চিরকাল যাবে না, স্রোতের বিরুদ্ধে শুরু হবে তার অভিযান। আদির কাছে ফিরে আসবে অন্ত, রক্তাক্ত

কলেবরে, স্রোতের বিরুদ্ধে, সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে। তখন অন্ত হবে অনন্ত, আদি হবে অনাদি। প্রলয়ের কালরাত্রে অন্তিম আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে তারা। তুমি তখন হাসবে…"

এই তুমির উল্লেখ তাঁর প্রতিটি কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র মতো ইনি কল্প-লোক-বাসিনী না। ইনি যে সশরীরে মর্ত্যে ছিলেন তার প্রমাণ অন্তত একবার পাওয়া গিয়েছিল। একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে কথা বলবার আগে শ্রীনাথ সেনের পারিবারিক পটভূমিকাটি আঁকা প্রয়োজন।

দুই

শ্রীনাথ সেন ছিলেন জমিদারের একমাত্র ছেলে। জমিদার হরিনাথ সেনের পরিচয় তাঁর জমিদারীর লোকেরা সকলেই জানত। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটি বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন চার-পাঁচ শো লোকের পাতা পড়ত। গরীব-দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকর, চাকরদেরও আত্মীয়, গরীব প্রতিবেশী সবাই খেত সেখানে। তাছাড়া অতিথিশালা তো ছিলই। তাঁর বাড়ির হাতাতেই পাঠশালা ছিল একটা, বিনা বেতনে বহু ছাত্র সেখানে পড়ত। এই সবই হরিনাথ সেনের বিলাস ছিল। মদে বা মেয়েমানুষে একটি পয়সা নষ্ট করেন নি তিনি। আশ্চর্যের বিষয়, এই জন্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি তাঁর বিরোধ বেধেছিল। তাঁর স্ত্রী সর্বাঙ্গসুন্দরীর বাপের বাড়ির চাল-চলন ছিল অন্য রকম। বাল্যকাল থেকেই মাইফেল দেখে অভ্যস্ত তিনি, ওস্তাদ-বাইজীর আড্ডা ছিল সে বাড়িতে। ঘরকুণো সাধু স্বামী পছন্দ হয় নি তাঁর। তিনি অধিকাংশ সময়েই বাপের

বাড়িতে থাকতেন। শ্রীনাথ সেনের জন্ম মামার বাড়িতেই হয়েছিল, বাল্যকালটাও কেটেছিল সেখানে। সম্ভবত মায়ের জেদেই তাঁকে বিলেত পাঠানো হয়েছিল। সেকালে বড়লোকদের ওই এক কায়দা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ, জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ সকলেই বিলেতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। শ্রীনাথ সেনও গয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত হন নি, কারণ তিনি বিখ্যাত হতে চান নি। চাইলে, হতেন। তিনি যখন বিষয়ের উত্তরাধিকারী হলেন, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন তিনি। সমস্ত জমিদারিটি বিক্রি করে দিয়ে কোলকাতায় এসে ভাড়া-বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। জমিদারি-প্রথার যে উচ্ছেদ হবে এ তিনি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সর্বাঙ্গ-সুন্দরীর মৃত্যু স্বামীর আগেই হয়েছিল।

শ্রীনাথ সেন তাঁর স্ত্রী ললিতা ও একমাত্র পুত্র আদিনাথকে নিয়ে আহিরিটোলায় ছোট একটি বাড়িতে থাকতেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, যদিও তিনি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। একটা ঘরে একা একা চুপচাপ থাকতে ভালবাসতেন। পরে জেনেছি, সেখানে বসে কবিতা লিখতেন। দিনরাত ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকতেন, অনেক সময় বোঝাও যেত না যে তিনি বাড়িতে আছেন কি নেই। তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারতেন না। তিনি যে ঘরে থাকতেন সে ঘরে আর একটি দরজা ছিল বাইরের দিকে। সেই দরজা দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর কাছে। তিনিও মাঝে মাঝে ওই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যেতেন। কোথায় যেতেন কেউ জানে না।

আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর খাস বেয়ারা হরলালের মাধ্যমে। হরলালকে তিনি ফরমাশ করেছিলেন একজন ভাল

লিখিয়ে যোগাড় করবার জন্যে। তাঁর ফরমাশ—হাতের লেখা শুধু মুক্তোর মতো হলেই হবে না তা শিল্প হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি একজন উঁচুদরের ক্যালিওগ্রাফার খুঁজছিলেন। আমার জানা-শোনা একটি লোক ছিল—সুরেন পাল। তাকে নিয়ে গেলাম একদিন। তিনি বললেন, আমার এই কবিতাগুলি খুব দামী কাগজে ভালো করে লিখতে হবে। সুরেন পালের কাজ দেখে পছন্দ হল তাঁর। কবিতা পিছু একশ টাকা করে দিতেন। আট-দশ লাইনের একটি কবিতা লিখতে প্রায় মাসখানেক লাগত। কী রঙে লেখা হবে তাই ঠিক করতেই কেটে যেত কয়েক দিন। নানা রকম রং এনে নিজেই মিশিয়ে মিশিয়ে দেখতেন, তারপর সুরেনকে বলে দিতেন সেটা। এই সূত্রেই তাঁর কবিতা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ছাপাবার কথা বলেছিলাম তাঁকে একবার। তিনি বলেছিলেন—ছাপাব? বলেন কি! প্রিয়াকে বাজারে বার করে না কি কেউ! কবিতা আমার অসূর্যম্পশ্যা প্রেয়সী।

নিজের বউকে কিন্তু তিনি খুন করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু সুরেন যা বলে তাই সত্যি বলে মনে হয়। সুরেনকে দিয়ে তিনি প্রায় একশটি কবিতা লেখান। লিখে সেটিকে ভালো মখমল দিয়ে বাঁধান। তাঁর স্ত্রী ললিতা দেবী নাকি তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। দশ বারোটা কবিতা ছাড়া, বাকি কবিতাগুলো সব পুড়ে যায়। দু-একটা আধ-পোড়া কবিতা আমি নিজেও দেখেছি। উপরে যেগুলির অনুবাদ দিলাম সেগুলির মধ্যে দুটি আধ-পোড়া কাগজ থেকেই উদ্ধার করেছি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ পুলিসও ঠিক করতে পারে নি। তাদের মতে ললিতা দেবী

আত্মহত্যা করেই মারা গিয়েছিলেন, কারণ তাঁকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। সমস্ত কাপড়ে জামায় স্পিরিট লাগিয়ে আগুন ধরানো হয়েছিল। স্পিরিট তিনি স্বহস্তে দিয়েছিলেন, না, শ্রীনাথ সেন ঢেলে দিয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় নি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছেলেকে তিনি বিলেত পাঠিয়ে দেন। আহিরীটোলার বাসায় তিনি একাই থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম অবশ্য। কিন্তু গিয়ে স্বস্তি পেতাম না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। প্রায়ই প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে থাকতেন। হঠাৎ এক একদিন বলতেন, কবিতা শুনবেন? লিখেছি একটা। কবিতা শোনবার জন্যেই যেতাম আমরা। আগ্রহ প্রকাশ করলে কোনো কোনো দিন শোনাতেন, কোনো দিন বা বলতেন, আজ থাক মেজাজটা ভালো নেই।

একটা গুজব কিন্তু চাউর হচ্ছিল ক্রমশ তাঁর সম্বন্ধে। তিনি নাকি গভীর রাত্রে কোথা যান। পায়ে হেঁটে যান। পাড়ার গাঙ্গুলী খুড়ো বললেন, "মেয়েমানুষ রেখেছে—।" মিত্তির মশাই নাকের দুটি ছ্যাঁদাই নস্যিতে বোঝাই করে বললেন, "রেখেছিস বেশ করেছিস। পয়সা আছে গুড় খাচ্ছিস, তবে অত ঢাক-ঢাক কেন। মরদকা বাচ্চা, যা করবি চুটিয়ে কর—"

এই ধরনের নানা আলোচনা হতে লাগল তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি কোথায় যান তা কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। দু-একজন তাঁর পিছু নিয়েছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি। তারা বলে, তিনি হয় গড়ের মাঠে, না হয় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মেয়েমানুষ দেখে নি তারা।

বছর কয়েক পরে তাঁর ছেলে ফিরে এল ব্যারিস্টার হয়ে। তার

ফিরে আসার দিন সাতেক পরেই শ্রীনাথ সেনের মৃত্যু হয়। শোচনীয় মৃত্যু। গড়ের মাঠেই একদল গোরার সঙ্গে লড়তে লড়তে মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর ব্যাঙ্কে একটি কপর্দকও আর নেই। তিনি গোরাদের সঙ্গে কেন লড়েছিলেন, কি করে তাঁর ব্যাঙ্কের অত টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল, এসবেরও কোনও সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারি নি আমরা।

মিত্তির মশাই বললেন, "মেম রেখেছিল বোধহয়, তাই গোরাদের আক্রোশ হয়েছিল। আর টাকাকড়ি সব ওই মাগীর গর্ভেই গেছে—এ তো সোজা হিসেব।"

লোহার সিন্দুকে একটি চিঠি ছিল, ছেলে আদিনাথের নামে। ছোট্ট চিঠি।

বাবা আদিনাথ,

ইচ্ছে করেই তোমার জন্যে ব্যাঙ্কে কিছু রেখে গেলাম না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, পিতৃপুরুষের জমানো টাকা নিয়ে যারা জীবন শুরু করে তারা প্রায়ই অমানুষ হয়। জীবনপথে বেশি টাকা থাকাটা নিরাপদ নয়। আশা করি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সে শিক্ষা তোমাকে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আশীর্বাদ জেন। ইতি, তোমার বাবা।

টাকা-কড়ির অভাব, সুতরাং শ্রাদ্ধের আয়োজন খুব সামান্যভাবেই করা হয়েছিল। আদিনাথ শ্রাদ্ধের কাজ আরম্ভ করতে যাবে, এমন সময় প্রকাণ্ড একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল, আর তার পিছু পিছু একখানা ট্যাক্সি।

মোটর থেকে কালো-বোরখা-পরা একটি মহিলা নেবে এলেন।

ধপধপে সাদা পা দুখানি ছাড়া তাঁর অঙ্গের আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আদিনাথ কোথা—"

আদিনাথ এগিয়ে গেল।

মহিলা তখন বোরখার ভিতর থেকে একটি দলিল বার করলেন। "এ দলিলটি নাও তুমি—"

"কিসের দলিল—?"

"দানপত্র। তোমার বাবা আমাকে দুটি বাড়ি করিয়ে দিয়েছিলেন, একটি গড়ের মাঠের কাছে, আর একটি গঙ্গার ধারে। সে দুটি তোমাকেই আমি দিয়ে যাচ্ছি। আর এটাও রাখ—"

মোটর ড্রাইভার একটি বাক্স নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

"তোমার বাবা আমাকে যে গয়না আর নগদ টাকা দিয়েছিলেন, তা এই বাক্সে আছে। এগুলোও তুমি নাও। আমার মোটরখানাও তুমি ব্যবহার কোরো।"

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম সবাই।

আদিনাথ বললে, "আপনি কে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না?"

"আমি ওঁর কবিতার তুমি। এই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এই বলেই উনি চলে যেতে উদ্যত হলেন।

আদিনাথ একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি যাচ্ছেন কোথা—"

"তীর্থে"

যে ট্যাক্সিটা মোটরের পিছু পিছু এসেছিল সেইটেতে চড়ে চলে গেলেন তিনি।

ভগবানের দয়া

দীননাথ মল্লিক দীনের নাথ হইতে পারেন নাই, সারাজীবন নিজেই তিনি অত্যন্ত দীন ছিলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি নাথ হইয়াছিলেন ভূতিবালার, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দৈন্য ঘোচে নাই, স্বয়ং লক্ষ্মীর আর এক নাম ভূতি হওয়া সত্ত্বেও ঘোচে নাই। আপিসের চাকরিতে যে গ্রেডে বাহাল হইয়াছিলেন, তদনুসারেই মাহিনা বাড়িয়াছিল, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হয় নাই। এক হিসাবে অবশ্য ভূতিবালা তাঁহার অনেক আর্থিক সুবিধা করিয়াছিলেন, তাঁহার একটিও সন্তান হয় নাই। দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে হইলে দীননাথ অকূলপাথারে পড়িতেন। তথাপি এই ব্যপদেশে তাঁহাকে কিছু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। সামর্থ্যহীন দরিদ্রেরও সন্তান আকাঙ্ক্ষা থাকে, দীননাথ এবং ভূতিবালারও ছিল। তাই ডাক্তারদের দ্বারে দ্বারে কিছুদিন তাঁহারা ঘুরিয়াছিলেন। প্রায় শতখানেক টাকা খরচ হইয়া যাইবার পর তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, সন্তান হইবার আশা নাই। একটি মেনি বিড়াল পুষিয়া ভূতিবালা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলেন। মেনিটি মরিয়া গেলে একটি টিয়া পুষিলেন। টিয়া মরিয়া গেলে ময়না। তাহার পর খরগোস। এইভাবেই তাঁহাদের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবন কাটিয়াছে। বাকি জীবনটাও হয়তো কাটিয়া যাইত, কিন্তু মুশকিল হইল যখন ভূতিবালার দক্ষিণ অঙ্গটি পড়িয়া

গেল। ষাট বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত হইলে তাহা আর সারে না। মৃত্যুই তখন একমাত্র ত্রাণকর্তা। মৃত্যু কিন্তু ভূতিবালাকে ত্রাণ করিল না। ভূতিবালা তো বিপদে পড়িলেনই, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা শতগুণ বিপদে পড়িলেন দীননাথ। দীননাথের বয়স সত্তরের কাছাকাকাছি। (সঠিক হিসাব আটষট্টি বৎসর দুই মাস ছয় দিন), আপনার জন বলিতে কেহ নাই। ওই ভূতিবালাই তাঁহার প্রিয়া শিষ্যা সচিব সব, উপরন্তু রাঁধুনী, চাকরানী, ধোপানিও। ভূতিবালার পক্ষাঘাত হওয়াতে দীননাথই পঙ্গু হইয়া পড়িলেন বেশী। কিন্তু ভগবান আছেন, তিনি দয়া করিলেন। কিছুদিন পূর্বে সুধাংশু বোসের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সেই ছোকরাই এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিল। সুধাংশু বোস সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার। চমৎকার ছেলে। এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি. এস. দুইটা ডিগ্রিই অর্জন করিয়াছে। লোক হিসাবেও মহানুভব। কোনো ফি না লইয়া সে ভূতিবালার চিকিৎসার ভার লইল, কিছু কিছু ঔষধপত্রও নিজের পকেট হইতে কিনিয়া দিল। ইহাতে দীননাথ কৃতার্থ তো হইলেনই, একটু লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়াও পড়িলেন। লজ্জিত হইলেন দারিদ্র্যের জন্য এবং অপ্রতিভ হইলেন আজকার ছোকরাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন বলিয়া। চিকিৎসা-রূপী ঝামেলা অনেকটা মিটিল বটে, কিন্তু ঝামেলা জিনিসটা সহজে মিটিবার নহে, অন্যান্য নানা রূপ ধারণ করিয়া তাহা দীননাথকে বিব্রত করিতে লাগিল। ভূতিবালার সেবা করে কে, পথ্য প্রস্তুত করে কে, তাঁহার নিজের জন্যই বা রান্না করে কে। এই সব জটিল সমস্যার সমাধান সহজ হইত যদি দীননাথ অর্থবান হইতেন। দীননাথ পেন্সন পান মাত্র পঁচানব্বুই টাকা। বাড়ি ভাড়া দিতে হয় পঁচিশ টাকা। বাকি সত্তর টাকায় কোনোক্রমে

দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ভূতিবালা অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহার জন্য খরচ কিছু বাড়িয়াছে। সুধাংশু ডাক্তার নানারকম ফুড এবং ভিটামিনের ব্যবস্থা করিয়াছে। গরম জলের সেক দিবার জন্য হটওয়াটার ব্যাগ কিনিতে হইয়াছে, বেডপ্যান, ইউরিনালও কিনিতে হইয়াছে। সবই ওই সত্তর টাকার মধ্যে। ইহার উপর চাকর বা রাঁধুনি রাখা সম্ভব নয়।

আবার ভগবান দয়া করিলেন। ওই সুধাংশু ডাক্তারই আবার একদিন দীননাথের দীনতার অন্ধকারে সত্যসত্যই সুধাংশুর মতো উদিত হইল।

"এই লোকটাকে নিয়ে এলাম। এ আপনার এখানে পেটভাতায় থাকবে। রাঁধতেও জানে। রাত্রে আপনার বারান্দায় শুয়েও থাকবে। রাখুন একে।"

একটি কুচকুচে কালো যুবক দীননাথকে নমস্কার করিল। দীননাথ ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে পেলেন কোথা?"

"আমার চেম্বারে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল। বলছে পশ্চিমে ওর বাড়িঘর ছিল, দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে। লেখাপড়াও শেখে নি বিশেষ, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। কোলকাতায় রোজকার করবার জন্যে এসেছে, কিন্তু কাজ পাচ্ছে না, তাই ভিক্ষে করে দিন চালাচ্ছে। আমি আপনার কথা বলাতে রাজী হল। আপনারও তো লোক দরকার একজন—"

"হ্যাঁ, খুব দরকার"

"একেই রাখুন তাহলে আপাতত"

কিছু খরচ বৃদ্ধি হইল, কিন্তু উপায় কি।

রাধিকারমণ দীননাথের বাড়িতে রহিয়া গেল।

দুই

কিছুদিন পরেই দীননাথ অনুভব করিলেন (মানে, আন্দাজ করিলেন) যে পূর্বজন্মে তিনি নিশ্চয়ই যৎসামান্য কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাই রাধিকারমণের মতো সর্বগুণান্বিত ভৃত্যটি তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। রান্না করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে, বাজার করে। ইহার উপর ভূতিবালার সেবা করিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু ভূতিবালা তাহা করিতে দেন না। পরপুরুষ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে ইহা তিনি চান না। দীননাথকেই সব করিতে হয়। কিন্তু এই কর্মটি দীননাথের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। ভূতিবালা স্থূলাঙ্গিনী, দীননাথ শীর্ণকায়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভূতিবালাকে নাড়াচাড়া করিবার শক্তি দীননাথের ছিল না। প্রত্যহ বিছানা বদলানো, গা মুছাইয়া দেওয়া, পিঠে স্পিরিট-পাউডার দেওয়া, বেডপ্যান দেওয়া-নেওয়া এ সব কর্ম দুই-একদিন করা যায়, রোজ করা সম্ভবপর নহে। দীননাথের খুবই কষ্ট হইতেছিল, ভূতিবালাও তাহা অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি। অসহায়ভাবে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পূর্বজন্মে কত পাপই যে করিয়াছি তাই এজন্মে স্বামীকে দিয়া নরক ঘাঁটাইতেছি। ভগবান আমাকে শাস্তি তো অনেক দিলে, এবার চরণে স্থান দাও। ভগবান কিন্তু এ অনুরোধটি রক্ষা করিলেন না। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না। দীননাথ নরকভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে অবশ্য ভগবান দয়া করিলেন। কিন্তু একটু অন্যভাবে। ভূতিবালার মৃত্যু হইল না, বিস্মৃতি অপনোদিত হইল। অনেকদিন পরে চামেলীকে তাঁহার মনে পড়িল।

চামেলী তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তাহারও তিনকুলে কেহ নাই। থাকে তাহার পিসামশায়ের কাছে জব্বলপুরে। তাহাকে লিখিলে সে হয়তো আসিতে পারে। টানিয়া টানিয়া কথাগুলি তিনি দীননাথকে বলিলেন। প্রস্তাবটি ভালো, তবু দীননাথকে মাথা চুলকাইতে হইল, সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হওয়ার মানেই খরচ বৃদ্ধি। এখনই তো রাধিকারমণ থাকাতে খরচ বেশ বাড়িয়াছে। চামেলী আসিলে সত্তর টাকায় কুলাইবে কি? ইহার উত্তরে ভূতিবালা যাহা বলিলেন তাহা কিন্তু খুবই আশ্বাসজনক। খবরটা দীননাথ জানিতেন না, চামেলীর কথাই জানিতেন না তিনি। চামেলীর পিতা নাকি পুলিসের সি. আই. ডি. ছিলেন। অগ্নিযুগে বোমারুদের ধরাইয়া দিতেন। অবশেষে একজন বোমারুর গুলিতেই তিনি নিহত হন। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেজন্য চামেলীর মা এবং চামেলীর জন্য মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া ভাতা দিতেন। চামেলীর মা মারা যাইবার পর ভাতা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও চামেলী প্রতি মাসে কিছু করিয়া পায়। কত পায় তাহা ভূতিবালা সঠিক জানেন না, কিন্তু তাহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন যে চলিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই, বিবাহ হইলে বিবাহের খরচস্বরূপ কিছু টাকাও নাকি গভর্নমেণ্ট দিবে। চামেলীর মা মারা যাওয়ার পর বাধ্য হইয়া চামেলীকে পিসামশায়ের নিকট যাইতে হইয়াছে, কারণ দেশে তাহার অভিভাবকত্ব করিবার মতো নিকট-আত্মীয় কেহ ছিল না। ভূতিবালার বিশ্বাস চামেলীকে খবর দিলে সে আসিবে। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন। সম্পর্কটা খুবই দূর, তাই দীননাথ প্রথমটা ইতস্তত করিতেছিলেন, কিন্তু শেষে মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ গুছাইয়া

একটি পত্র চামেলীকে, আর একটি তাহার পিসামশায়কে লিখিয়া দিলেন। ভগবান আবার দয়া করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পিসামশায়ের উত্তর পাওয়া গেল। সংক্ষিপ্ত উত্তর। লিখিয়াছেন, চামেলীকে লইয়া শীঘ্রই যাইতেছি, সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। দিন সাতেকের মধ্যে তিনি চামেলীসহ আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন। সাক্ষাতে যাহা বলিবেন লিখিয়াছিলেন তাহা গোপনে দীননাথকেই বলিলেন।

"মহাবিপদে পড়েছিলাম মেয়েটাকে নিয়ে মশাই। পাড়ার চার পাঁচটা ষণ্ডা ছোঁড়া দিনরাত আমার বাড়ির চারদিকে চক্কোর মারে। সিটি দেয়, রাত্রে টর্চ ফেলে, চিঠি লেখে। আর মেয়েটাও একটু ফরওয়ার্ডগোছের, বুঝলেন। কি করব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এমন সময় আপনার চিঠিটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক ঢিলে দুই পাখি মল। আপনার উপকারও হল, ওকে ওখান থেকে সরানোও হল।"

পিসামশায়ের মুখেই তিনি শুনিলেন চামেলী গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিমাসে পঁচাত্তর টাকা করিয়া ভাতা পায়। বিবাহ হইলে এক হাজার টাকা দিতেও গভর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন, তবে এখন স্বদেশী গভর্নমেণ্ট হইয়াছে, দিবে কিনা কে জানে। পিসামশায়ের মতে ও-মেয়ের বিবাহ হইবে না, ধাঁড়াইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ষাঁড়ের মতো মোটা ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।

পিসামশায় পরদিনই চলিয়া গেলেন।

দীননাথ এবং ভূতিবালা লক্ষ্য করিলেন চামেলী মেয়েটি হাস্যমুখী, একটু সাজগোজ করিতে ভালবাসে, আর খুব নেটিপেটি। খাটিতেও পারে খুব। গায়ে জোরও আছে। অবলীলাক্রমে সে ভূতিবালার

সেবার সমস্ত ভার লইল। দীননাথের মনে হইল সবই ভগবানের দয়া। সব শুনিয়া সুধাংশু ডাক্তারও খুশী হইল।

কিন্তু আর একটি সমস্যা দেখা দিল দুই মাস পরে।

তিন

ভূতিবালার মনেই দেখা দিল প্রথমে। পক্ষাঘাত হওয়াতে তাঁহার দেহটাই অসমর্থ হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিল, মন মোটেই নিষ্ক্রিয় হয় নাই। মাস দুই পরে স্বামী দীননাথের জন্য তাঁহার একটু চিন্তা হইল। চামেলী সম্পর্কে দীননাথের কোনও অশোভন আচরণ অবশ্য তিনি দেখেন নাই—দেখিবেনই বা কিরূপে, তিনি তো শয্যাগত—কিন্তু ভূতিবালা অনুভব করিতে লাগিলেন যে চামেলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ঘনিষ্ঠতা তো হইবেই, দুটি মাত্র ঘর, দুটি ঘরের মধ্যে যে দরজা আছে তাহাতে কপাট নাই, তাছাড়া শালী সম্পর্ক, ঘি ও আগুন···ভূতিবালার আশঙ্কা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবারও উপায় নাই। ভূতিবালা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করা যায়। চামেলী তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, দীননাথ তো অপরিহার্যই। ভূতিবালা চিন্তা করিয়া কোনো কূল কিনারা পাইতেছিলেন না, হঠাৎ কিন্তু একদিন তিনি মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। দীননাথ তাঁহার ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতিয়া শুইতেন। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল, লক্ষ্য করিলেন দীননাথ বিছানায় নাই। দুই একবার ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না।

চামেলী পাশের ঘরে থাকে, তাহারও সাড়া পাইলেন না। একটু পরে দীননাথ চামেলীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

"এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে গো ?"

"পায়খানায়। তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে এ দরজাটা আর খুলি নি, চামেলীর ঘর দিয়েই গিয়েছিলাম।"

"চামেলী কোথা ?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"একটু ডেকে দাও তো। মাথার বালিশটা সরে গেছে।"

"আমিই ঠিক করে দিচ্ছি। ও বেচারী সমস্ত দিন খাটে তো, মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে।"

চামেলীর প্রতি এই দরদটুকু ভূতিবালার একেবারে ভালো লাগিল না। ঈর্ষার জ্বালা যদি পক্ষাঘাতের অব্যর্থ ঔষধ হইত তাহা হইলে ভূতিবালা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিতেন। তিনি সেদিন আর কিছু বলিলেন না। পরদিন চামেলী যখন রাস্তার কল হইতে জল আনিতে গেল, তখন তিনি প্রস্তাবটি করিলেন।

"দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। চামেলী সোমত্ত মেয়ে, ওর সঙ্গে তোমার এমনভাবে মেলা-মেশা করাটা লোকত ধর্মত খুবই খারাপ দেখাচ্ছে। অথচ অন্য উপায়ও তো নেই। তাই আমি বলছি, ওকে তুমি বিয়েই করে ফেল—"

দীননাথ আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বলছ কি তুমি !"

"ঠিকই বলছি। ভগবানের দয়ায় বলতে নেই তোমার শরীরটি এখনও সুস্থ আছে। কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারলুম না, আমি এখন তোমার গলগ্রহ। আর আমাকে সেবা

করবার জন্যেই চামেলীকে এনেছি, ওকে ছাড়া আমাদের চলবেও না, তাই বলছি বিয়ে কর ওকে, পালটি ঘরও আছে, তোমার দিক থেকেও ভালো হবে, আমার দিক থেকেও হবে। এরকম বিয়ে তো কত হয়। ভেবে দেখো কথাটা—"

দীননাথ ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে গিয়া কিন্তু তিনি অনুভব করিলেন যে, ব্যাপারটাকে প্রণিধান বা পর্যালোচনা করিতে হইলে সুধাংশু ডাক্তারের প্রাজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইবে। ছোকরার বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। তাছাড়া হিতৈষীও। তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছু করা চলিবে না।

সব শুনিয়া সুধাংশু বলিল, "আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন। এ অবস্থায় বিয়ে করাই উচিত, আর করলে ক্ষতিই বা কি। আর কিছু না হোক কেলেঙ্কারির ভয় থাকবে না। সত্যি আপনার নামে আপনার পাড়ার লোকেরা ফুসফুস গুজগুজ আরম্ভ করেছে, কানে এসেছে আমার। বিয়েই করে ফেলুন। জড়ই মেরে দিন ব্যাপারটার।"

"কিন্তু এই বয়সে বিয়ে করে যদি আবার ছেলেপিলে হয়ে যায় তাহলেই তো মুশকিল! যদিও অবশ্য আগে জনকয়েক ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, আমার ছেলেপিলে হবে না। কিন্তু যদি হয়ে যায়—"

"তাহলে এক কাজ করুন। আসুন আপনার ভাসেক্‌টমি করে দি।"

"সে আবার কি।"

"সামান্য একটা অপারেশন। ওটা করে দিলে ছেলেপিলে হওয়ার ভয় আর একদম থাকবে না। আর ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না,

চামেলীর কানে যেন না যায়। শুনলে হয়তো সে-ই আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না।”

“না, না আমি কাউকেই বলব না। বেশী সিরিয়াস অপারেশন নয় তো?”

“আরে না, না সে কিছুই নয়। চামেলী কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?”

“না তাকে জিগ্যেস করা হয়নি এখনও।”

“জিগ্যেস করুন। যদি রাজী হয় খুব ভালো হবে আপনার পক্ষে। আপনার স্ত্রী যে এত বুদ্ধিমতী তা জানতাম না।”

“ওর দেহটাই মোটা, বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। এতদিন দেখছি তো—”

ভূতিবালাই কথাটা চামেলীর কাছে পাড়িলেন। সে হ্যাঁ বা না কিছুই বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল কেবল। ভূতিবালা এবং দীননাথ উভয়েই বুঝিলেন সম্মতি আছে। দিনকয়েক পরে সুধাংশু তাঁহার অপারেশনটুকুও করিয়া দিল। দীননাথ বাড়িতে রটাইলেন যে, কুঁচকির কাছে একটা ফোড়া হইয়াছিল সুধাংশু ডাক্তার সেটা অপারেশন করিয়া দিয়াছে। দিন সাতেক শুইয়া রহিলেন, তাহার পর সব ঠিক হইয়া গেল। তাহার পর পাঁজি দেখা হইল, মাসখানেক পরে বিবাহের শুভ দিনও একটা পাওয়া গেল। কিন্তু গোল বাঁধিয়া গেল হঠাৎ একটা। হিন্দু কোড বিল পাশ হইয়া গেল। আইন হইল এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলিবে না। করিতে হইলে আদালতের সহায়তা লইয়া প্রথম বিবাহ বন্ধনটি বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। দীননাথ ইহাতে রাজী হইলেন না। বিবাহ-বিচ্ছেদ করিবার সঙ্গত কারণ

অবশ্য দীননাথের ছিল, আদালত হয়তো তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিতেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। বরং এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, ভূতিবালা ও সুধাংশু জোর করিয়া তাঁহার স্কন্ধে চামেলীকে চাপাইবার চেষ্টায় ছিল, আইনটা পাশ হওয়াতে তিনি রক্ষা পাইলেন। বলিলেন, সবই ভগবানের দয়া।

চার

মাস ছয়েক পরে ভূতিবালা স্বর্গারোহণ করিলেন।

বিবাহের বাধা অপসারিত হইল, তবু কিন্তু দীননাথ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মাস দুই কাটিল। তারপর হঠাৎ চামেলী একদিন তাঁহাকে বলিল, "এবার বিয়েটা হয়ে যাক, আর দেরি করা উচিত নয়।"

"কেন"—বিস্মিত দীননাথ প্রশ্ন করিলেন।

উত্তরে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া গেল। চামেলী সন্তান-সম্ভবা!

ছুটিয়া চলিয়া গেলেন তিনি সুধাংশু ডাক্তারের কাছে। সমস্ত শুনিয়া ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিল, "তাহলে সম্ভবতঃ আমি অপারেশনটা ঠিক করে করতে পারি নি।"

"কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হলপ করে বলছি—"

"চুপ করুন। ভাবতে দিন আমাকে।"

দীননাথ থামিয়া গেলেন। সুধাংশু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম হইয়া

রহিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে দীননাথ আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আর একটা বিপদও হয়েছে।"

"আবার কি।"

"রাধিকারমণও কাল থেকে সরেছে।"

সুধাংশুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল।

"এখন কি করি বলুন।"

"বিয়েই করে ফেলুন চামেলীকে। ও ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

বিবাহ হইয়া গেল। যথা সময়ে চামেলী একটি কুচকুচে কালো পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সুধাংশু তাহার নাম রাখিয়া দিল—কোকিল কুমার।

পাঁচ

আরো পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

চামেলীরও মৃত্যু হইয়াছে। সুধাংশু ডাক্তারও একটা বড় চাকরি পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। দীননাথের বয়স প্রায় পঁচানব্বই। কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চোখে দেখিতে পান না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কোকিলকুমার এখন পঁচিশ বৎসরের যুবক। সে লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো ছিল, এখন ভালো চাকরি করিতেছে। সে-ই এখন স্থবির দীননাথের একমাত্র অবলম্বন। দীননাথ ভাবেন, সবই ভগবানের দয়া।

পৌরাণিক-আধুনিক

শুনে আমি বললাম, "ওকে হাসপাতালেই নিয়ে যান—"

"কেন, আপনি পারবেন না ?"

পাঠক মশাই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পারব। কিন্তু হাসপাতালেই এ-সব করা ভাল। আজকাল যিনি লেডি ডাক্তার এসেছেন তাঁর খুব হাত-যশ।"

চুপ করে রইলেন পাঠক মশায় কয়েক মুহূর্ত।

তারপর মুচকি হেসে বললেন, "একটি গল্প শুনবেন ?"

"কী গল্প—"

"পৌরাণিক গল্প। যদি শোনেন তো বলি—"

যদিও খুব বিরক্ত লাগছিল, তবু প্রবীণ পাঠক মশায়কে বলতে পারলাম না যে শুনব না।

"বলুন।"

"পুরাকালে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিবাহ করবার কিছু দিন পরে তিনি অনুভব করলেন যে, তিনি পথ-ভ্রষ্ট হয়েছেন, ব্রহ্ম থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছেন, মায়াতে জড়িয়ে পড়ছেন, অবিলম্বে সাবধান না হলে অকূল পাথারে ডুবতে হবে। অবিলম্বেই সাবধান হলেন তিনি। বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করলেন একদিন। হিমালয়ে গিয়ে শুরু

করলেন কঠোর তপস্যা। বহুদিন তপস্যা করবার পর ভগবান তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'বৎস, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি—বর দিচ্ছি। যে-কোনো লোককে তুমি অমর করে দিতে পারবে। এবার বাড়ি যাও।' ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর পত্নী বৃদ্ধা হয়েছেন এবং একটি সুদর্শন যুবক তাঁর পরিচর্যা করছে। পত্নী বললেন, 'এটি আমাদের পুত্র। তুমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই এ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। একে অবলম্বন করেই আমি এতকাল তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। পুত্রটি কর্তব্যপরায়ণ এবং বিদ্বান হয়েছে, ওর চরিত্রও নির্মল। কিন্তু সেদিন ভৃগু মুনি ওর হস্তরেখা বিচার করে বললেন যে, আর এক বছর মাত্র ওর পরমায়ু আছে। শুনে থেকে আমি বড় বিমর্ষ হয়ে আছি। এর কি কোনও উপায় নেই?'

"তপস্বী উত্তর দিলেন, 'তুমি চিন্তা কোরো না, ওকে আমি অমর করে দিতে পারি। সে-শক্তি আমি অর্জন করেছি।'

"বৃদ্ধা এতটা প্রত্যাশা করেনি।

'ও তাই না কি। তাহলে ওকে অমরই করে দাও।'

"তপস্বী ক্ষণকাল চিন্তা করলের। তারপর বললেন, 'আমি এখনই করে দিতে পারি, কিন্তু আমি করলে সেটা ভাল দেখাবে না, কারণ ও আমার ছেলে। আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করছি। তিনিই এসে করে দিন।'

"স্মরণ করবামাত্র বিষ্ণু এলেন।

"সব শুনে বললেন, 'তা এর জন্যে আমাকে ডাকলে কেন। তুমি তো নিজেই ওকে অমর করে দিতে পার।'

"তপস্বী বললেন, 'তা পারি। কিন্তু আপনি করে দিলে আরও ভাল হয়। আপনি স্বয়ং বিষ্ণু—'

"বিষ্ণু বললেন, 'আরও ভালর কথা যদি তুললে তাহলে ব্রহ্মার কাছে চল। পিতামহ যদি একে অমর করে দেন তাহলে আর কারও কিছু বলবার থাকবে না।'

'বেশ চলুন।'

"তপস্বী, বিষ্ণু এবং সেই যুবক তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, 'এর জন্যে আমার কাছে আসা কেন। তোমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনই তো একে অমর করে দিতে পারতে।'

'কিন্তু আপনি করে দিলে দেখতে শুনতে সব দিক দিয়েই ভাল হয়।'

'দেখতে শুনতে ভাল হয় যদি মহেশ্বর করে দেন। চল তাঁর কাছেই যাই।'

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তপস্বী আর সেই যুবক মহেশ্বরের কাছে গেলেন।

"সব শুনে মহেশ্বর বললেন, 'এর জন্যে এতদূর এলে? তোমাদের তিনজনের মধ্যে যে-কেউ একজন তো করে দিতে পারতে।'

"ব্রহ্মা বললেন, 'কিন্তু আপনি করে দিলে কাজটা একেবারে পাকা হয়।'

'পাকা হয় ভাগ্যবিধাতা যদি নিজের খতিয়ানে ওকে অমর বলে লিখে নেন। বেশ, চল, ভাগ্যবিধাতার কাছেই চল, পাকাই করে ফেলা যাক ব্যাপারটাকে—'

"পাঁচজনে ভাগ্যবিধাতার দপ্তরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

একটি প্রকাণ্ড পাথরে-তৈরী সিংহদ্বারের ভিতর দিয়ে সে-দপ্তরে ঢুকতে হয়। সিংহদ্বারে ঢুকছেন এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সিংহদ্বারের উপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর খসে পড়ল যুবকটির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তার। হাহাকার করে উঠলেন তপস্বী।

"ভাগ্যবিধাতা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'মুনিবর এখন হাহাকার করে কী হবে। ওর মৃত্যুর জন্যে আপনিই দায়ী।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ আপনি। আপনি ওকে অনায়াসেই অমর করে দিতে পারতেন কিন্তু তা না করে আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিয়ে আমার কাছে এলেন। এই দেখুন আমার খাতায় লেখা রয়েছে, ওই যুবক যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর তার বাবাকে নিয়ে আমার সিংহদ্বারের ভিতর ঢুকবে তখনি সিংহদ্বারের একটি পাথর ওর মাথায় পড়ে ওর মৃত্যু হবে। এই অসম্ভব যোগাযোগ আপনিই করেছেন—।'

গল্পটি বলে পাঠক মশায় বললেন, "ঊষার প্রথম যখন ব্যথা ধরল তখন গেলাম নার্স আভার কাছে। সে বললে, আমি পারি, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল হবে শশীবাবু ডাক্তার যদি ভার নেন। শশীবাবুর কাছে গেলাম, তিনি আপনার কাছে আসতে বললেন। আপনি এখন বলছেন হাসপাতালের লেডি ডাক্তারের কাছে যেতে—"

আমি হেসে বললাম, "ঊষার ভালর জন্যেই বলছি। পরীক্ষা করে দেখলাম ছেলেটা ঠিক সোজাভাবে নেই, ট্রান্সভাস প্রেজেনটেশন। এ সব হাসপাতালেই ভাল হয়। তা ছাড়া ঊষার শরীরে রক্তও কম, পা দুটো ফোলা। হয়ত ব্লাড দেওয়ার দরকার হবে, হাসপাতালেই নিয়ে যান ওকে—"

পাঠক মশায় হাসপাতালেই নিয়ে গেলেন ওকে।

হাসপাতালে উষা মারা গেল।

মাস দুই পরে ঠিক এই রকম একটা কেস আমার হাতে এল।

মফস্বলের এক জমিদারের পুত্রবধূ। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, "প্রসব করিয়ে দেব, কিন্তু হাজার টাকা চাই।"

রাজী হলেন তাঁরা।

নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেল। প্রসূতি সন্তান উভয়কেই সুস্থ অবস্থায় রেখে, ফী নিয়ে চলে এলাম। কিছুদূর এসেছি, এমন সময় গাড়ির টায়ার গেল ফেটে। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করতে লাগল, আমি নেমে পায়চারি করতে লাগলাম মাঠে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, "আমাকে তাহলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন কেন কাকাবাবু আমার বাবা আপনাকে অত ফিস্ দিতে পারবেন না বলে—"

দ্রুতপদে ফিরে এলাম মোটরের কাছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় আমরা রয়েছি বল তো? অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু।"

"আজ্ঞে, এটা শ্মশান।"

ভাবতে লাগলাম, কথাগুলি কে বললে, উষা না আমার বিবেক?

নবজীবন-স্রোত

শ্রীযুক্ত রামবৃছ সিং শ্রীযুক্ত কমলকুমার মিত্রের প্রতিবেশী, পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেন। পরিচয় বেশী দিনের নয়, কারণ উভয়েই অল্প কিছুদিন পূর্বে চাকুরি ব্যপদেশে এই শহরে আসিয়াছেন এবং দৈবাৎ পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ভাড়াটে-রূপে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। সুযোগও ছিল না। দুইজন দুই বিভিন্ন আপিসে চাকরি করেন। একজন পোস্ট-অফিসে, একজন রেলে। নিজের নিজের আপিস আর সংসার লইয়াই দুইজনকে ব্যস্ত থাকিতে হয়, প্রতিবেশীর সংবাদ লইবার মত অবসর মেলে না। ছুটির দিনেও না। ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এতটা ঔদাসীন্য দেখা গেল না। কমলকুমারের দশ বছরের ছেলে অমলকুমার রামবৃছের বারো বছরের ছেলে ছবিলালের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। তাহাদের আলাপ করিবার সুযোগও ছিল। একই স্কুলে একই ক্লাসে ভরতি হইয়াছিল তাহারা।

অমলকুমার একদিন তাহার মাকে বলিল, "মা, জান ছবিলাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, সে সেভ্‌ন্ বলতে পারে না, বলে—সেভুন।"

কমলকুমার আয়নার সম্মুখে নানা মুখভঙ্গি করিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ছবিলাল কে?"

"পাশের বাড়িতে থাকে। ওর বাবার নামটাও অদ্ভুত। রামবৃছ—"

অমল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলকুমার বলিলেন, "ও, বুঝেছি। রামবৃছ সিং আমাদের পাশের বাড়িতে আছে না কি ?"

"হ্যাঁ—"

গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া কমলকুমার বলিলেন, "ওঁর জায়গায় আমাদের বিশ্বেশ্বরবাবুর আসবার কথা ছিল। তিনি ওর চেয়ে সিনিয়র লোক, কিন্তু তিনি তো বিহারী নন, কোনো মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর কোনো আত্মীয়তাও নেই—"

কমলকুমার বাঁকা হাসি হাসিয়া গাল চাঁছিতে লাগিলেন।

একটি নাতি-সুচরিত্রা ঠিকা দাই বারান্দা ঝাড়ু দিতেছিল। সে বাংলা বোঝে, রামবৃছবাবুর বাড়িতেও কাজ করে। সে যথাসময়ে উক্ত কথোপকথনটি রামবৃছবাবুর পরিবারে নিবেদন করিল। রামবৃছবাবু সংবাদটি শুনিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিত্ত অমৃত-নিষিক্ত হইল না। তিনি গোঁফে চাড়া দিয়া একটি উদ্‌গার তুলিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, শালা বাঙালিয়া—!

কমলকুমারের বাড়িতে সরবরাহ করিবার মতো একটি সংবাদও একদিন উক্ত ঠিকা দাই সংগ্রহ করিয়া আনিল।

কমলকুমারের গৃহিণী সহসা একদিন সকালে হাতে আকাশের চাঁদ পাইয়াছিলেন। একজন ফেরিওয়ালা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া কিছু চিংড়িমাছ এবং নোনাইলিশ তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল। তিনি মহা-সমারোহে সেগুলি রন্ধন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রন্ধনকালে সম্ভবতঃ রান্নাঘরের জানালাটি খোলা ছিল, চিংড়িমাছ

এবং নোনা ইলিশের গন্ধ বায়ু-বাহিত হইয়া রামবৃছ সিংয়ের অন্তঃপুরকে আমোদিত করিয়া তুলিল। রামবৃছ তখন রহরকা দাল ও নিমকি সহযোগে মোটা আটার রোটি চর্বণে ব্যাপৃত ছিলেন। গন্ধ পাইয়া তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

দাইকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ঘর মে কোই জানবর মরল বা ?"

দাই মুচকি হাসিয়া আড়ঘোমটা টানিয়া নিবেদন করিল যে, না, কোনও জানোয়ার মরে নাই, পাশের বাড়ির বাঙালিন বহু মৎস্য রন্ধন করিতেছেন।

রামবৃছ নাকে কাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, ছি ছি ছি ! ই বাংগালি লোগ আদমি নেই খে, গিধ্ বা।" অর্থাৎ বাঙালীরা মানুষ নয় শকুনি, মরা জানোয়ার খায়।

ঠিকা দাইটি কমলকুমারের পত্নীর নিকট এই খবরটিও যথাসময়ে মুচকি হাসিয়া নিবেদন করিল।

আপিস হইতে ফিরিয়া কমলকুমারও সংবাদ শুনিলেন। একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, "ও বেটা ছাতুখোর মাছের মর্ম কি বুঝবে !"

এ খবরটিও রামবৃছের অবিদিত রহিল না। উভয় পক্ষেই উত্তাপ বাড়িতে লাগিল। তাহা হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল যখন রামবৃছ একদিন শুনিলেন যে, একজন সিনিয়র বাঙালীকে ডিঙাইয়া তাঁহাকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে—এ খবরটি বঙ্গদেশ হইতে প্রকাশিত কোনও ইংরেজী পত্রিকায় কে. কে. নামক কোন পত্রলেখক প্রমাণসহ বাহির করিয়া দিয়াছেন। রামবৃছ আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হইল, কে. কে. কমলকুমার ছাড়া আর

কেহ নন। তিনি নিজের ইয়ারমহলে বাঙালীদের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধের আয়োজন কমলকুমারও করিলেন। তাঁহার পুত্র অমলকুমার অতিশয় কম নম্বর পাইয়া কোনোক্রমে ক্লাস-প্রমোশন পাইয়াছিল এবং বাড়িতে আসিয়া বলিয়াছিল যে, শিক্ষকেরা সব হিন্দী ভাষায় পড়ান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহা ছাড়া তাঁহারা পার্শিয়ালিটি করিয়া বেহারী ছেলেদের বেশী নম্বর দেন। কমলকুমার ইহা শুনিয়া যে সব ভাষা ব্যবহার করিলেন তাহা রীতিমত সাহিত্যিক ভাষা। গানই বাঁধিয়া ফেলিলেন একটা। 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের প্যারডি।

বেহার আমার মাসীমা আমার
ধাইমা আমার আমার দেশ
কাহে গে মাইয়া এইসা হালৎ
কাহে গে তোরা এইসা বেশ!
একদা যাহার ভোজপুরিয়া
হেলায় দাঙ্গা করিল মাৎ
আজিও যাহার রাজমিস্ত্রি
জেনানি লইয়া পিটিছে ছাৎ
ময়লা ঘাড়ে পানি-পাঁড়ে
খাঁকি কোর্তা মুরেঠা সাজ
তাদেরই বংশে এ কি প্রহ্লাদ
কলম পিষিছে আপিসে আজ!

—এইভাবে সমস্ত গানটারই প্যারডি লিখিয়া ফেলিলেন।

রামবৃছ সিংয়ের বাড়ির সামনের নর্দমায় একদিন জল আটকাইয়া গেল। দেখা গেল মাছের আঁশ ও নাড়িভুঁড়ি আসিয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

রামবৃছ দন্ত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "শালা মছলিখোর!"

দোলের দিনে রামবৃছের পরিবারবর্গ কাদায় রঙে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া অশ্রাব্য ভাষায় 'হোলি' গাহিতে লাগিল।

কমলকুমার কানে আঙ্গুল দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্যাটা বেহারী ভূত!"

এই ভাবেই কিছুদিন চলিল। হয়তো বরাবরই চলিত; কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া গেল।

রামবৃছ সিং একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, কমলকুমারের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে একটি সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। সামিয়ানার নীচে টেবিল-চেয়ারও অনেক আনা হইল। ফুলের মালাও অনেক আসিল। সন্ধ্যার সময় শহরের অনেক বাঙালী যুবক আসিয়া সমবেত হইলেন। কৌতূহলী রামবৃছ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কেন?"

সে উত্তর দিল, "বাংলা ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক 'নবজীবন'-এর নাম শুনেছেন?"

"খুব।—"

"তাঁর আজ জন্মদিন। তাঁকে আমরা সম্বর্ধনা জানাব বলে এই আয়োজন করেছি।"

"নবজীবন কি এখানে এসেছেন?"

"আরে, তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই থাকেন। তাঁর আসল নাম কমলকুমার ঘোষ। এখানকার এ. এস. এম.।"

রামবৃছের আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল কেবল।

সম্বর্ধনা-সভা শেষ হইয়া গিয়াছে। শেষ যুবকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কমলকুমার যখন বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তখন রামবৃছ আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "শুনিয়ে—"

কমলকুমার ঘাড় ফিরাইতেই রামবৃছ করজোড়ে বলিলেন, "পহলেই ম্যয় মাফি মাংতা হুঁ। মুঝে মালুম নহি থা যে আপহি 'নবজীবন' হ্যঁয়। ম্যয় আপকা ভকত হুঁ।"

কমলকুমারও হাতজোড় করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রামবৃছ বলিলেন যে, তিনি যদিও বাংলা বলিতে পারেন না, কিন্তু বাংলা বুঝিতে পারেন। 'নবজীবন'-লিখিত অনেক গল্প তিনি অনুবাদ করিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। কমলকুমার বলিলেন, "তাই নাকি? 'স্রোত' নাম দিয়ে আর একজন লেখকও আমার গল্পের চমৎকার অনুবাদ করেছেন দেখেছি"

রামবৃছ হাতজোড় করিয়া স্মিতমুখে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ম্যয় স্রোত হুঁ।"

উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

ঊর্মির পছন্দ

চার বছরের ঊর্মি তার দাদুর সঙ্গে গিয়েছিল গঙ্গার ধারে বেড়াতে। শীতকালের গঙ্গা, বালুর চর বেরিয়ে পড়েছে চারদিকে, আর সেই চরের মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে বইছে জলের ধারা। স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চিকমিক করছে বালি।

"ওগুলো কি দাদু"

"বক—"

"চারটেই বক ? অত সাদা কেন"

"ফরসা জামা কাপড় পরেছে"

"অমন গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কেন আস্তে আস্তে"

"তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে বোধ হয়"

"কেন"

"তোমাকে বিয়ে করতে চায়"

ঊর্মি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বকগুলোর দিকে।

"চারটেকেই আমি বিয়ে করব ?"

"করলে ক্ষতি কি। দ্রৌপদী তো পাঁচজনকে বিয়ে করেছিল—"

"দৌপদী কে ?"

র-ফলা বেরোয় না ঊর্মির মুখে।

"সে গল্প আর একদিন বলব তোমাকে"

"এখনি বল না"

"আগে ঠিক কর বকদের বিয়ে করবে কি না"

ঊর্মি ঘাড় বেঁকিয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—"করব না। বড্ড লম্বা গলা ওদের, ঠুকরে দেবে না?"

"ঠিক বলেছ, কথাটা ভাবি নি তো"

খঞ্জনও চরছিল কয়েকটা জলের ধারে। দুতিন রকম খঞ্জন, কারও হলদে বুক, কারও সাদা মুখ, কালো পিঠ, কারও ছাই রং, ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে মনের আনন্দে চরে বেড়াচ্ছিল সবাই। একটা খঞ্জন লাফ দিয়ে উঠতেই ঊর্মি দেখতে পেলে সেটাকে।

"দেখ দেখ দাদু আর একটা পাখি। একটা নয় অনেকগুলো। কি রকম লাফালাফি করছে। ল্যাজও দোলাচ্ছে। দেখতে পেয়েছ?"

"আমি অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ওরা এদেশের পাখি নয়, বিদেশ থেকে এসেছে। অনেক দূর থেকে মাঠ, বন, পাহাড়, নদী পার হয়ে"

"অনে—ক দূর থেকে?"

"হ্যাঁ"

"কেন এসেছে"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে"

"আমাকে"

"তাই তো মনে হচ্ছে। কেমন সেজে এসেছে দেখছ না?"

"ওরা তো পাখি। পাখিকে বিয়ে করলে মা-বাবা বকবে না?"

"বকবে কেন"

"তাহলে পাখির খাঁচায় হাত দিলে মা বকে কেন"

"টিয়া পাখি যে কামড়ে দেয়"

"ও। খঞ্জন কামড়ায় না বুঝি"

"না। কি সুন্দর দেখছ না? কেমন খুর-খুর করে বেড়াচ্ছে—"

"বড্ড ছটফটে কিন্তু। কি রকম লাফালাফি করছে দেখেছ?"

"খঞ্জন তাহলে তোমার পছন্দ নয়"

"নাঃ"

"ওই দুটোকে পছন্দ হয়?"

"কোন দুটোকে? ওই যে খঞ্জনদের ওপাশে চরে বেড়াচ্ছে?"

"কি পাখি ওরা?""

"বাটান। ছোট বাটান, গলায় কেমন সুন্দর কালো কণ্ঠি দেখেছ—"

"কোথায় থাকে ওরা"

"ওরাও বিদেশে থাকে। এখানে বেড়াতে এসেছে"

"কেন"

"তোমাকে বিয়ে করবে বলে"

"সব্বাই আমাকে বিয়ে করবে বলে এসেছে?"

"তুমি পছন্দ করলেই করবে"

"আমার কাউকে পছন্দ নয়"

"তাহলেই তো মুশকিল। মানুষ বর পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। পাখিই একটা পছন্দ করতে হবে"

"কি পাখি"

"চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ যেটা তোমার পছন্দ হয়"

ঊর্মি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"ওগুলো কি দাদু"

এক ঝাঁক সোয়ালো উড়ছিল জলের উপর। সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছিল তাদের কৃষ্ণ-নীল পিঠের রং। থামছিল না এক মুহূর্ত। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল ক্রমাগত।

"ওগুলো সোয়ালো। বাংলা নাম আবাবিল"

"ওরাও কি বিয়ে করবে বলে এসেছে?"

"তাইত মনে হচ্ছে"

"ওদের আমি বিয়ে করব না। বিচ্ছিরি নাম। তাছাড়া একটুও বসছে না, খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, গল্প করব কখন? আচ্ছা দাদু ওরা আমাদের মতো কথা বলতে পারে তো—!"

"শেখালে পারবে। টিয়াটা কেমন কথা বলে শুনেছ তো।"

"চমৎকার কথা বলে টিয়াটা। কিন্তু বড্ড কামড়ায় যে। বাঃ, ওই পাখিটা তো চমৎকার, কি ওটা—"

গাছের ডালে একটা শালিক বসে ছিল, ঘাড় নেড়ে নেড়ে ডাকছিল যেন উর্মিকে।

"ওটা শালিক—! ঘাড় নেড়ে নেড়ে তোমাকে ডাকছে—চল ওর কাছেই যাওয়া যাক—"

গাছটার দিকে এগিয়ে যেতেই 'পিড়িং' শব্দ করে উড়ে গেল শালিকটা।

তারপর দাদুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরল উর্মি। দাদু তাকে আরও পাখি, গাছপালা, আকাশের মেঘ, সবুজ গমের ক্ষেত দেখালেন। উর্মি কিন্তু বেশ একটু অন্যমনস্ক। যে গাছটায় শালিক পাখিটা বসে ছিল সেই গাছটার দিকে ফিরে ফিরে চাইছে কেবল।

দাদু ডাকলেন—"উর্মি—"

উর্মি মুচকি হেসে বললে "পিড়িং—"

"ওকি—"

"আমি শালিক পাখি হয়েছি। শালিককেই বিয়ে করব। ওর ঠোঁটটা বেশ সুন্দর হলদে, নয়? ঠিক আমার ফ্রকের মতো"

দুদিন আগে উর্মিকে হলদে রঙের ফ্রক কিনে দেওয়া হয়েছিল।

"বেশ, তাহলে শালিকের কাছেই লোক পাঠাই গে চল—! রাজী হয় তবে তো?"

উর্মিকে নিয়ে গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এলেন দাদু।

ছবি

আমি হিরণ সেনের কাছে প্রথমে চিকিৎসক হিসাবেই গিয়েছিলাম। আমাকে যিনি ডাকতে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রতিবেশী, আত্মীয় নন। পরে জেনেছিলাম তাঁর আত্মীয় কেউ নেই, থাকলেও খবর নেন না। প্রতিবেশী সমরবাবুই তাঁর দেখাশোনা করেন। চাকর-বাকর অবশ্য আছে।

সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"উনি বিয়ে-থা করেন নি?"

"না। যে ধরনের লোক সাধারণত বিয়ে-থা করে সংসার পাতে উনি সে ধরনের লোক-নন।"

"ও—"

সমরবাবু গোড়াতেই আমাকে বলেছিলেন ওঁর কি হয়েছে। কোমরের নীচে থেকে সমস্ত অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে, আমাদের ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে ট্রান্সভার্স মায়েলাইটিস্। সাধারণত সিফিলিস এর কারণ। সমরবাবু যা বললেন তা শুনে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে।

সমরবাবু রোগীর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ইনিই হিরণবাবু, এঁরই চিকিৎসা করতে হবে আপনাকে।"

আমি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলাম।

সিফিলিস বলেই সন্দেহ হল।

বললাম, "রক্তটা একবার পরীক্ষা করানো দরকার।"

হিরণবাবু বলে উঠলেন, "একবার কেন, দশবার পরীক্ষা করা হয়েছে। সমর ওই ড্রয়ার থেকে রিপোর্টগুলো বার করে দাও তো ভাই"—

দেখলাম। প্রত্যেকটি রিপোর্টেই এক বার্তা, রক্তে কোনো দোষ নেই। একটু আশ্চর্য হলাম।

হিরণবাবু বললেন, "আপনিও যদি রক্ত পরীক্ষা করতে চান করুন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনারা যে পদ্ধতিতে চলছেন তাতে আমার অসুখ সারবে না। কোলকাতার সব বড় ডাক্তারকেই দেখিয়েছি আমি, ওষুধ, ইনজেকশন, ইলেকট্রিক চিকিৎসা সব রকম হয়েছে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন কিচ্ছু হয় নি—"

সমরবাবু বললেন, "আচ্ছা, আপনারা তাহলে গল্প করুন আমি ঘুরে আসছি একটু পরে। একটু কাজ আছে আমার। আপনার ট্রেনের এখন ঘণ্টা দুই দেরি। আমি ঠিক সময়ে এসে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব।"

সমরবাবু চলে গেলেন।

হিরণবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কি বুঝছেন আপনি—"

যা বুঝেছিলাম তা অকপটভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা হচ্ছিল। চুপ করে রইলাম।

"চুপ করে রইলেন যে—"

"আপনার এ অসুখ সারবে না—"

দুজনেই চুপ করে গেলাম এর পর।

মিনিটখানেক পরে হিরণবাবু বললেন, "আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি এখনও।"

কোনও রোগীই আশা ছাড়ে না। শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর মনে পড়ল—স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং। চুপ করে রইলাম।

হিরণবাবু আবার বললেন, "না, আশা ছাড়ি নি আমি। আপনি যদি ডাক্তারি না করে অন্য একটা উপায় অবলম্বন করেন তাহলে হয় তো সেরে যেতে পারি আমি। শুনেছি আপনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন ভক্ত।"

"তাঁর অসংখ্য ভক্তের মধ্যে আমিও একজন। কে বললে আপনাকে একথা—?"

"আপনারই একজন রোগী। শরৎ বাবুকে মনে পড়ে আপনার? শরৎ মিত্তির? আপনি তাঁর হাঁপানির চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁর মুখেই শুনেছি আপনার কথা।"

"মনে পড়েছে?"

মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। প্রায়ই হত মাঝে মাঝে।

"কিন্তু তার সঙ্গে আপনার অসুখের সম্পর্ক কি?"

"আপনি আমার হয়ে স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করুন, তাহলেই আমার বিশ্বাস অসুখ সেরে যাবে।"

"আপনিই করুন না।"

"আমি সর্বদাই করছি। কিন্তু আমার প্রার্থনায় কাজ হচ্ছে না, হবেও না।"

"প্রার্থনায় ফল হবে এই যদি আপনার বিশ্বাস, তাহলে কোনও ভালো সাধুকে দিয়েই প্রার্থনা করান। আমি অতি সামান্য লোক—"

"আমি সে চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু কেউ রাজী হন নি। তারপর শরৎ বাবুর মুখে আপনার কথা শুনলাম। তাই আপনাকে

ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। চিকিৎসার জন্যে ডাকাই নি আপনাকে। তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন, চিকিৎসাও করতে পারেন। কিন্তু আমার অনুরোধ, একান্ত অনুরোধ, প্রার্থনা করুন আমার জন্যে, যদি ভালো হই ওতেই হব। দয়া করুন আমার উপর—"

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন হিরণবাবু। বলাবাহুল্য খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন, এ বিশ্বাস যদি আপনার সত্যিই থাকে তাহলে যা হয়েছে সেটাকে হাসি মুখে মেনে নিন।"

চোখের জল মুছে হিরণবাবু বললেন, "সেটা আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ স্বামীজী আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমি ডাকলে তিনি আর ফিরবেন না, আপনাদের মতো সচ্চরিত্র সত্যবাদী লোক যদি অনুরোধ করেন তাহলে হয় তো ফিরতে পারেন। আপনি চেষ্টা করুন আমার জন্যে—"

কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো মনে হচ্ছিল।

"কোন স্বামীজীর কথা বলছেন?"

"স্বামী বিবেকানন্দ।"

"তিনি ফিরবেন কি করে। তিনি তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন—"

হিরণ সেন ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—"সমস্ত ঘটনা খুলে বলি তাহলে আপনাকে। শুধু একটা অনুরোধ, আমাকে পাগল মনে করবেন না। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে অবশ্য, কিন্তু যা বলছি তার একবর্ণ মিথ্যা নয়—"

হিরণবাবু আবার চুপ করে গেলেন। আবার মাথা হেঁট করলেন।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"বলুন, কি বলবেন—"

মাথা তুলে হিরণবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বলছি। দেখুন, ছাত্রজীবন থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের খুব ভক্ত ছিলাম। বিয়ে-থা করি নি। যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য পালন করেই চলতাম। না, কথাটা একটু ভুল হল। হয় তো আপনার একটা ভুল ধারণা হয়ে যাবে যে, স্বামীজীকে ভক্তি করতাম বলেই বুঝি বিয়ে-থা করি নি। স্বামীজীকে ভক্তি করতাম খুবই, কিন্তু বিয়ে করি নি অন্য কারণে। যে মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছিল তাকে আমি পাই নি। সহজ সামাজিক উপায়ে পাওয়ার উপায়ও ছিল না। সে ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি কায়স্থ। শেফালীরও অনেক দিন বিয়ে হয় নি, কারণ তার মায়ের সঙ্গতি ছিল না বিয়ে দেবার। নিতান্ত গরীব বিধবা ছিলেন তিনি। আমি অনেকবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নি। এইভাবেই চলছিল, আমি দূর থেকে তাকে দেখেই সন্তুষ্ট ছিলাম। একদিন হঠাৎ শুনলাম শেফালীর বিয়ে হচ্ছে এক ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে। শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। শেফালীর সঙ্গে বিয়ে হবে ওই বুড়োর! ঠিক করলাম প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না। টাকার অভাব ছিল না আমার। কোলকাতা থেকে গুণ্ডা আনালাম। বিয়ের রাত্রে ঠিক বিয়ে হবার আগেই লুট করে নিয়ে এলাম শেফালীকে। নিয়ে এসে এই ঘরেই আটক করলাম তাকে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে বিয়ে করবে তুমি?'

"শেফালী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'কিছুতেই না। কায়স্থের সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে হয় না। আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিন।'

"আমার তখন রোখ চড়ে গেছে, সংযমের প্রাচীরেও ফাটল দেখা দিয়েছে। বললাম, 'কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি হয় তো জানো না আসুরিক বিবাহও আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধ। আসুরিক মতেই তোমাকে বিবাহ করব আমি। পৃথিবীতে কোনও শক্তি নেই যে আমাকে বাধা দিতে পারে'—এই বলে জাপটে ধরলাম তাকে।

"সে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল। তাকে বাঁচাতে পারে ত্রিসীমানায় এমন লোক সত্যিই সেদিন কেউ ছিল না। যারা ছিল তারা আমারই বেতন ভোগী গুণ্ডা। এরপর কি হল জানেন? ঝনঝন করে একটা শব্দ হল। ঘরের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের যে ছবিটা টাঙানো ছিল দেখি তার কাচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর স্বয়ং স্বামীজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। রাগে থরথর করে কাঁপছেন।

"বজ্র নির্ঘোষে বললেন, 'পাষণ্ড, এখুনি ছেড়ে দাও ওকে'।

"আমার কোমরে একটা লাথি মারলেন, আমি পড়ে গেলাম; সেই থেকেই কোমর ভেঙে পড়ে আছি—"

হিরণ সেন থামলেন।

"তারপর?"

"তারপর শেফালীর দিকে ফিরে স্বামীজী বললেন, 'এসো মা তুমি আমার সঙ্গে এস।'

"শেফালীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। আর ফেরেন নি। ওই দেখুন ফ্রেম খালি—"

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এইবার দেখলাম, দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা ফ্রেমে-বাঁধানো কার্ড-বোর্ড ঝুলছে। ভিতরে ছবি নেই।

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম ফ্রেমটার দিকে।

"শেফালীর কি হল?"

"সে-ও আর ফেরে নি। অনেকে বলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি জানি স্বামীজী তাকে নিয়ে গেছেন!"

হিরণবাবু হু হু করে কাঁদতে লাগলেন।

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

হিরণবাবুর ডাক্তারি চিকিৎসা আমি করি নি। তবে তাঁর জন্য রোজ প্রার্থনা করতাম। সেদিন খবর পেলাম তিনি মারা গেছেন।

চম্পা মিশির

"জিৎ গিয়া হুজুর।"

সোৎসাহে রামজানের ছেলে সলিম এসে খবরটা দিল। তারপর সেলাম করে চলে গেল।

মনে পড়ল চম্পা মিশিরকে। এখনও আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, সোজা হয়ে বসে আছেন টমটমের উপর ঘোড়ার রাশ ধরে, আর যার টমটম সে পিছনের দিকে বসে আছে স-সঙ্কোচে। বেশ লম্বা লোক ছিলেন, কিন্তু চওড়া নয়, সরু লিকলিকে চেহারা। অসুস্থ নয়, ওই রকমই গড়ন। গোঁফ ছিল, দাড়ি ছিল না। গোঁফ সরু, ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যেত না। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিশে থাকত। গায়ের রঙ কালো ছিল না। গোধূম্ বর্ণ। গোঁফও তাই। ছোট ছোট চোখের তারাও কটা ছিল। মেরজাই পরতেন, মাথায় থাকত মৈথিলী পাগড়ি, কাপড় আঁট-সাঁট করে পরা, পায়ে দেশী নাগরা জুতো সর্বণ মুচির তৈরী, অন্য মুচির জুতো পছন্দ হত না তাঁর। তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার অনেক আগেই তাঁকে দেখেছিলাম আমি। রোজই দেখতাম। বস্তুতঃ না দেখে উপায় ছিল না। আমার ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যে রাজপথ চলে গেছে তার উপর টমটম হাঁকিয়ে রোজ যেতেন তিনি। এতেও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ যার টমটম সে-ই

হাঁকায়, আরোহী পাশে বা পিছনে বসে থাকে। আরোহী চম্পা মিশির কিন্তু নিজেই টমটম হাঁকাতেন, যার টমটম সে পাশে বা পিছনে বসে থাকত। এ খবরটাও আমি পরে জেনেছি।

যেদিন উনি আমার দোকানের সামনে টমটম থেকে পড়ে গিয়ে একটু আঘাত পেলেন, সেই দিনই ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল। আঘাত সামান্যই, পায়ের গোছটা একটু ছড়ে গিয়েছিল। পায়ে একটু টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে দিলাম। এর পর চম্পা মিশির যা করলেন তাতে আমি নিঃসন্দেহ হলুম, ওর পায়ের হাড়ে কিছু লাগে নি। উনি লাফিয়ে নেবে গেলেন আমার ল্যাবরেটরির বারান্দা থেকে, সঙ্গের লোকটাকে হুকুম করলেন, ঘোড়াটাকে ধর ভাল করে, মুখটা শক্ত করে ধরে থাক। সে ধরতেই আগা-পাশ-তলা চাবকালেন ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে পিছু হটছিল বলেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেজন্যে শাস্তি দিলেন তাকে। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, মিশিরজি টমটমের মালিক নন, আরোহী মাত্র। ঘোড়াটাকে পিটিয়ে মিশিরজি আবার আমার ল্যাবরেটরিতে এসে বসলেন এবং ভাঙলেন কথাটা। মৈথিলীমিশ্রিত হিন্দীতেই কথা বলতেন তিনি। আমি ভাবার্থটা অনুবাদ করে দিচ্ছি। বললেন, এমন বোকা এ দেশের লোক ডাক্তারবাবু, পয়সা দিয়ে ওই ঘোড়া কিনেছে। ও যতটা এগোয়, তার চেয়ে পিছোয় বেশী। এ টমটমে কোন সোয়ারি চড়বে বলুন? আমাকেই এখন ঠিক করতে হবে, কদিন লাগবে কে জানে?

পরে আরও অনেক ঘটনা থেকে জেনেছি, বাজে ঘোড়াকে ঠিক করাতেই ওঁর আনন্দ। ইংরেজীতে যাকে বলে রঙ হর্স (wrong

horse) তাকে ব্যাক করেও উনি আনন্দ পেয়েছেন জীবনে। ওঁর বাড়ি গঙ্গার ওপারে মফস্বলে, অনেক জমি-জায়গা আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। কিন্তু শহরে উনি প্রত্যহ আসতেন স্টীমারে পেরিয়ে। বাড়ি থেকে স্টীমারঘাটে আসতেও প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হত ওঁকে। কিন্তু তাতে আনন্দই পেতেন উনি, বলতেন, এইভাবে হাঁটার ফলে শরীর বেশ ভাল থাকে। স্টীমারঘাটে নেবেই একটা টমটম ভাড়া করতেন সমস্ত দিনের জন্য। যে টমটমের ঘোড়া খারাপ সেইটেই পছন্দ করতেন তিনি। তা বলে তাকে যে কম ভাড়া দিতেন তা নয়, বরং বেশীই দিতেন। আর টমটমটা নিজেই হাঁকাতেন। সেই খারাপ ঘোড়া যতদিন না ঠিক হত ততদিন সেই টমটমকেই বাহাল করে রাখতেন। এই সব কারণে মিশিরজিকে আরোহীরূপে পাবার জন্য সব টমটমওলাই ব্যগ্র হত। দু-একজন ঠকাতও। অর্থাৎ টমটমের ঘোড়া খারাপ না হলেও তাঁকে আরোহীরূপে পাবার জন্যে মিথ্যে করে বলত যে, তার ঘোড়া খারাপ। কিন্তু মিশিরজির কাছে এসব চালাকি চলত না, ঘোড়ার রাশ থাকত তার হাতে। একদিন আমার ল্যাবরেটরির সামনে টমটম থামিয়ে নেবে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, একটা রুগী নিয়ে এসেছি, দেখুন তো শালার যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন, আরে, ইধার আ—

টমটমওলা ছোঁড়াটা মুচকি হেসে নেবে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে এর ?

মিশিরজি তার মুখের দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, শালা ঝুঠ্‌ঠা ছে। অর্থাৎ শালা মিথ্যাবাদী। টমটমের ঘোড়া ভাল কিন্তু খারাপ বলে চালিয়েছে তাঁর কাছে। হেসে বললাম, এর তো কোনও দাবাই নেই আমার কাছে—

চম্পা মিশির তখন ছোঁড়ার একটা কান টেনে বললেন, তা হলে পুরানা দাবাই দিয়ে দি একটু। অমন তেজী ভাল ঘোড়া, বলে কি না খারাপ—

তারপর তাকে একটা সিকি দিয়ে বললেন, দু আনার ছাতু তুই খা, আর দু আনার ঘোড়াটাকে খাওয়া। পেট ভরা থাকলে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে না।

সিকিটা নিয়ে সানন্দে বেরিয়ে গেল ছোঁড়া, মিশিরজি আমার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে গেলেন তার পিছু পিছু।

মিশিরজি শহরে এসে ব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। আদালতেই বেশীর ভাগ সময় কাটত তাঁর। রোজই তাঁর একটা না একটা মকদ্দমা থাকত। তাঁর নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল সেই পক্ষের মকদ্দমার তদ্বির করতেন উনি। তার জন্য উকিল ব্যবস্থা করতেন, সাক্ষী যোগাড় করতেন, নিজেও পরামর্শ দিতেন। শহরে তাঁর একটা ছোট বাসা ছিল, সেই বাসায় আশ্রয় দিতেন তাদের। একজন ভাল উকিলের মুখে শুনেছি, মিশিরজি মকদ্দমা বুঝতেনও ভাল। মোটামুটি আইনের জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া বিপক্ষকে জেরা করবার এমন সব ঘাঁত-ঘোঁত বলে দিতে পারতেন যে, অনেক বুদ্ধিমান উকিলেরও তাক লেগে যেত। সুতরাং মকদ্দমাতেও মিশিরজিকে স্বপক্ষে টানবার জন্য চেষ্টা করত অনেকে। এ বিষয়ে খুব সুনাম ছিল তাঁর। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এসব করে তাঁর কি লাভ হয়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সময় কাটে। কিন্তু তিনি কখনও সবলের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। যার কেস কম-জোর, যার অর্থাভাব, যে পুলিসের বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে নাজেহাল হচ্ছে, চম্পা মিশির সর্বদা তার পক্ষে।

উকিলরাও, বিশেষ করে নূতন উকিলরা, খুব সমীহ করত তাঁকে। সাধারণতঃ যে সব উকিলের মক্কেল জুটত না তাঁদেরই নিযুক্ত করতেন তিনি। দরকার হলে কোনও নামজাদা উকিলের পরামর্শ যে না নিতেন তা নয়, কিন্তু মকদ্দমার সম্পূর্ণ ভার থাকত নূতন উকিলটির উপর। পরে যাঁরা নামজাদা উকিল হয়েছিলেন তাঁরাও প্রথম জীবনে মিশিরজির সাহায্য পেয়েছিলেন, সুতরাং সে মহলেও মিশিরজির খুব খাতির ছিল। একবার এক উকিল কমিশন দিতে চেয়েছিলেন, তাঁকে। মিশিরজি জিব কেটে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয় খেলা।

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমাকেও অনেক রোগী পাঠিয়েছেন তিনি মফস্বল থেকে। মফস্বলের নিরীহ রোগীদের কাছে আমার সম্বন্ধে এমন সব অত্যুক্তি করতেন যা শুনে আমি লজ্জিত হতাম। আমি নাকি খুন পরীক্ষা করে তড়াক্‌সে (চট করে) সমস্ত রোগ নির্ণয় করে ফেলতে পারি। মাঝে মাঝে অপ্রস্তুতও হতে হত। একবার তাঁর প্রেরিত এক রোগী এসে বলল যে, তার রক্ত পরীক্ষা করে বলে দিতে হবে তার শ্বশুরের রক্তে কোনো দোষ আছে কি না! বললাম, আমি তা পারব না। কিন্তু লোকটা না-ছোড়। বলল, মিশিরজি যখন বলে দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি পারবেন। ফী যা লাগে আমি দেব, কাজটা করে দিন। বললাম, তোমার শ্বশুরকেই পাঠিয়ে দাও। সে বলল, তিনি থাকলে তো নিয়েই আসতাম। কিন্তু তাঁর নামে সম্প্রতি হুলিয়া বেরিয়েছে বলে তিনি কোথায় যে আত্মগোপন করে আছেন তা কেউ জানে না। বললাম, তা হলে আমি পারব না।

পরদিন চম্পা মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল সে।

চম্পা মিশির এসেই আমাকে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, খুন লে লিজিয়ে ডাক্‌টার সাহেব।

আমি পুনরায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চম্পা মিশির হাত তুলে ঈষৎ অধীরভাবে যা বললেন তার ভাবার্থ—আমি এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি রক্তটা তো আগে নিয়ে নিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাসারম্যান টেস্টের জন্য নিলাম খানিকটা রক্ত।

মিশিরজি লোকটার দিকে ফিরে বললেন, ফিস্‌ রাখখো। লোকটি একটি এক শো টাকার নোট আমার সামনে রাখল। আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম যে, এক শো টাকা এর ফী নয়। মিশিরজি আবার হাত তুলে বারণ করলেন আমাকে। আদেশের ভঙ্গিতে আবার বললেন, উঠা লিয়া যায়। তুলে নিলাম নোটটা।

মিশিরজি তখন সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, অব তুম্‌ যাও।

চলে গেল সে।

তখন আমি মিশিরজিকে বললাম, আপনি যা বলছেন তা তো করা অসম্ভব। ওর রক্ত দেখে ওর শ্বশুরের—

মিশিরজি বললেন, আপনি ওরই রক্তে দোষ আছে কি না দেখুন। কিন্তু রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে। ওর নাম প্রয়োগ সিং ওর শ্বশুরের নাম প্রাণেশ্বর সিং।

আমি বললাম, এ রকম চাতুরীর অর্থ কি!

মিশিরজি তখন যা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, এ লোকটির ছেলে হয়ে হয়ে মরে যাচ্ছে। সিভিল সার্জন বলেছেন—হয় এর রক্তে, না

হয় এর স্ত্রীর রক্তে, কিংবা উভয়েরই রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে। কিন্তু এরা দুজনেই হলফ করে ঘোষণা করেছে যে এদের চরিত্র স্ফটিকের মতো নির্মল। ওর স্ত্রী তো রক্ত পরীক্ষাই করাতে চায় না। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে, ভয়ানক কলঙ্ক রটে যাবে একটা। মানী বংশ ওদের। সব দিক বাঁচাতে হবে। তখন আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গেল। পলাতক খুনী শ্বশুরের ঘাড়ে দোষটা চাপালে সব দিক রক্ষে হয়। এ ছোকরার রক্তে দোষ পাবেন আপনি। কারণ ও বাইরে সাধু সেজে থাকে, কিন্তু আমি জানি, ও ডুবকি মেরে জল খায়। আপনি রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে।

বললাম, কিন্তু এক শো টাকা তো আমার ফী নয়।

তা-ও জানি আমি। এটা ওর জরমানা ঝুট বলেছে বলে।

রক্তে দোষ ছিল। চিকিৎসার পর ছেলেও হয়েছিল ওদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। গরদের জোড় দিয়ে প্রণাম করেছিল আমাকে প্রয়াগ সিং।

মিশিরজি সম্বন্ধে নানা ঘটনা মনে পড়ছে।

আর একটা ঘটনা বলি। একবার আমার বাড়িতে এসেছিলেন। চা দিতে গেলাম, বললেন চা খান না।

শরবৎ আনিয়ে দেব ?

তা দিতে পারেন।

শরবৎ যখন এল তখন বললেন, আপনি খাবেন না ?

আমার তো চিনি খাওয়ার উপায় নেই। ডায়াবিটিস আছে—

শরবৎটি শেষ করে মুখ মুছে বললেন, ইয়ে বাৎ ? চিনি সে

আপকো ঝগড়া হয়, আচ্ছা, বিনা চিনিসেই আপকো শরবৎ পিলাউঙ্গা—

তার পরদিন এক ঝুড়ি বড় বড় লেবু নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, এর নাম হচ্ছে শরবতিয়া লেবু। দুটো লেবুর রস গেলে এক গ্লাস জলে দিয়ে দিন, এক গ্লাস শরবৎ হয়ে যাবে, চিনি দিতে হবে না। দেখলাম সত্যিই তাই। অবশ্য এত মিষ্টি লেবুও ডায়াবিটিস-রোগীর পক্ষে অচল, কিন্তু সে কথা তাঁকে বলি নি। পরে তিনি শরবতিয়া লেবুর গাছও একটা দিয়েছিলেন আমাকে। আমার হাতার এক ধারে এখনও আছে বোধ হয় সেটা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাকে ডেকেছিলেন একবার।

আমাকে দেখেই হেসে বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়, শেষ দেখা করবার জন্যে ডেকেছি। এবার আর মকদ্দমায় জেতবার আশা নেই। মহাকালের শমন এসেছে, যেতেই হবে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না—

তারপর একটু থেমে বললেন, যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, যদি পারেন কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রমজান বলে একটা গরিব লোক আছে। ভেড়া আছে তার একটা। ভেড়াটা আগে খুব ভাল লড়ত। রমজান ওকে লড়িয়ে রোজকার করত কিছু। কিন্তু গত দু বাজিতে হেরে গেছে ভেড়াটা। রমজান বলছে, ও দানা হজম করতে পাচ্ছে না, তাই কম-জোর হয়ে গেছে। এখানে কাছেপিঠে তো ভাল পশুচিকিৎসক নেই। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু? লোকটা গরিব, ওই ভেড়া-লড়িয়েই রোজকার করত—

বললাম, আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে।

দু দিন পরে খবর পেলাম মিশিরজি মারা গেছেন।

মানুষেরই ওষুধ দিয়েছিলাম ভেড়াটাকে। বাজি জিতেছে যখন, উপকার হয়েছে নিশ্চয়ই।

মনে হচ্ছে, চম্পা মিশিরের মতো লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালী বিহারী হিন্দু মুসলমান—এসব ভেদ ছিল না যাদের কাছে···?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, শরবতিয়া লেবুর গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চারদিক খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালাম ভাল করে। গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।

ত্রি-ফলা

স্বরেন্দ্রনাথ একটি খাতা খুলিয়া পড়িতেছিলেন ঃ—

শুকরির সঙ্গে দেখা হল মাছের বাজারে। কোলে একটি ফুট ফুটে মেয়ে, ওরই মেয়ে। আমাকে দেখে একটু সলজ্জ হাসি হেসে একপাশে সরে দাঁড়াল। আমি ওর মেয়েটির গাল টিপে আদর করলুম একটু। শুকরি যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। আমার মনে হল, যাক শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটছে তাহলে।

শুকরি মেথরের মেয়ে। আমি যখন প্রথম এসে ল্যাবরেটরি খুলি তখন ওর ঠাকুরদা মুননিকে আমি বহাল করেছিলাম। তখন শুকরির বাপ সিতাবীই ছেলেমানুষ। সতেরো-আঠারো বছর বয়স বিয়ে হয়নি তখনও। মুননি মদ খেত খুব, গাঁজাও। ছোট ছোট চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল হয়ে থাকত সর্বদা। কিন্তু কখনও বেচাল হয়নি, কখনও বেয়াদপি করেনি। মদ গাঁজা খেত বটে, কিন্তু খাওয়াটা যে অন্যায় এ বোধটা তার ছিল। সর্বদাই যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে থাকত। একদিন মুননির বউ রঙীন-কাপড় পরা ঘোমটা-দেওয়া একটি মেয়েকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। বললে, সিতাবীর বিয়ে দিয়েছি হুজুর, দেখুন কনিয়া কেমন হয়েছে। গোড় লাগ—। নববধূ আমাকে আমার স্ত্রীকে প্রণাম করে বখশিশ নিয়ে

চলে গেল। বেশ বউটি। সত্যিই রূপসী। অমন রূপ ভদ্রঘরেও সচরাচর দেখা যায় না। কতদিন আগেকার কথা, অথচ মনে হচ্ছে যেন সেদিন। সিতাবীর বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরেই মুননি মারা গেল। তার কিছুদিন পরে মুননির বউও। সিতাবীর তখন বহাল হল তার বাপের জায়গায়। আমার চোখের সামনেই ওই শুকরির জন্ম হয়েছে। আমার ল্যাবরেটারির বারান্দাতে ও হামাগুড়ি দিয়েছে, তারপর বড় হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। তারপর বিয়ে হল ওর একদিন। কোলকাতার এক মেথর এসে বিয়ে করে নিয়ে গেল ওকে। মাঝে মাঝে খবর পেতাম ও সুখে আছে। কলকাতার মেথররা ধর্মঘট করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছে, ওদের পাকা ঘর-বাড়ি। এর কিছুদিন পরে সিতাবীর বউ মারা গেল যক্ষ্মায়, সিতাবী আবার বিয়ে করল। বেশী মাইনের লোভে আমার চাকরি ছেড়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকল। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়।

প্রায় বছর তিনেক পরে একদিন সকালে দেখি শুকরি আমার বাড়ির উঠোনের একধারে বসে আছে। মুখে হাসি নেই, চুল উসকো-খুসকো। পরনের কাপড়টা রঙীন বটে কিন্তু ছেঁড়া।

"কিরে কবে এলি ?"

শুকরি মাথা নীচু করল।

"কবে এলি তুই, তোর ছেলে হয়েছে শুনেছি, ছেলে কই—"

শুকরি মাথাটা আরও নীচু করলে। দেখলাম কাঁদছে।

"কি হল তোর ? বল না, কি হয়েছে—"

অনেক জেরার পর জানা গেল শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে সে।

স্বামী পাগল। ছেলেটাকে কেড়ে রেখে দিয়েছে ওরা।

আমার গিন্নী কিছু খেতে দিলেন ওকে। বাড়িতে কিছু বাসি মাংস আর রুটি ছিল। শুকরি বসে বসে সেগুলি খেলে। খাবার পরও বসে রইল।

"কি রে, আরও খাবি ?"

শুকরি মাথা নেড়ে জানালে খাবে। পারত-পক্ষে কথা বলতে চায় না, কারণ তোতলা।

আরও দুখানা রুটি খেলে। তবু নড়ে না। খানিকক্ষণ পরে আসল মনোভাবটি ব্যক্ত করলে।

"কা-কা-পড়া দে একটো—"

একটা শাড়ি দিলেন গিন্নী, পুরোনো রঙীন শাড়ি। তবু উঠতে চায় না। আরও আট আনা পয়সা নিয়ে তবে উঠল।

…দিন দশেক পরে দেখলাম শুকরি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। একেবারে অন্য রকম চেহারা। রঙীন শাড়িটি বেশ কায়দা করে পরেছে, যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে শাড়িটির ভাঁজে ভাঁজে। মাথায় তেল দিয়ে পরিষ্কার করে চুল আঁচড়েছে, সিঁদুর পরেছে, হাতে পরেছে কাঁচের বাহারে চুড়ি একগোছা ! চোখে মুখে হাসি ঝলমল করছে।

তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা।

মাস দুই পরে খবর পেলাম—(আমার মেথরটাই খবর দিলে)—শুকরি ডোমনের সঙ্গে ফেঁসে গেছে, তার বাড়িতে গিয়েই আছে নাকি।

ডোমন আর একটি মেথর, বিবাহিত।

এরও মাসখানেক পরে আবার একদিন দেখি শুকরি মাথা নীচু করে বসে আছে এসে আমাদের উঠানে, গিন্নী যৎপরোনাস্তি ভৎ র্সনা করছেন তাকে। কাঁদছে সে। শুনলুম ডোমনের প্রথম বউ

শুকরিকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুকরি তার বাবার কাছে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার বাবাও দূর করে দিয়েছে তাকে, কারণ সে অন্তঃসত্ত্বা। তাকে ঘরে স্থান দিলে সমাজে একঘরে হতে হবে। সুতরাং অকূল পাথারে পড়েছে শুকরি।

গিন্নী আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি এর ব্যবস্থা কর একটা। তা না হলে ও মুখপুড়ি আমাদের বাড়িতেই আড্ডা গাড়বে এসে।

মেথরদের উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল আমার, কারণ মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ অফিসার ডাক্তার সেন আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর সহায়তায় সিতাবী, ডোমন এবং আরও জনকয়েক প্রবীণ মেথরকে ডেকে পাঠালাম। ছোটখাটো একটা সভা হল আমার বৈঠকখানায়। সেই সভায় স্থির হল যে শুকরির বেচালের জন্যে সিতাবীকে পঁচিশ টাকা আর ডোমনকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এ টাকায় ভোজ হবে একটা। শুকরি সকলের সামনে কান মলে নাক মলে বলবে যে এমন কাজ সে আর কখনও করবে না। এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ডোমন শুকরিকে বিয়ে করবে। ডোমনের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে শুকরি যদি মানিয়ে না চলতে পারে তাহলে ওর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে সিতাবীকে। ডাক্তার সেন বললেন শুকরিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করে দেবেন একটা। সুতরাং তাই হল। শুকরি পঞ্চায়েতের সামনে নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করল যে সে আর বিপথে যাবে না।

আজ আবার মাছের বাজারে দেখলুম শুকরির মুখে আবার হাসি ফুটেছে।

কোলের মেয়েটা বোধ হয় ডোমনের মেয়ে। হঠাৎ আর একটা ঘাড়-ছাঁটা মেথর ছোঁড়া শুকরির পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাতে

একটা ইলিশ মাছ। ডোমন নয়, আর একজন। আমাকে সেলাম করে চলে গেল তারা। বুঝলাম হারামজাদি আবার একটা জুটিয়েছে কাকে, আবার ফ্যাসাদ বাধাবে।

মনে হল এদের নীতি-কথা বলে সংশোধন করা শক্ত। তার চেয়ে জন্ম শাসন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে হয়তো সমাজের উপকার হয়—

এই পর্যন্ত পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ঠাকুরদার ডায়েরিটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলেন।

বন্ধু বিকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুকরি কিন্তু ঠাকুরদার উপদেশ শোনে নি। চোদ্দটা ছেলে মেয়ে হয়েছিল তার। তুমি যে কিষুণের কাছে ইলেকশনে হেরে গেছ সে ওই শুকরিরই ছেলে—"

"তাই নাকি"

"হাঁ। আমরা ভদ্রলোকেরা জন্মশাসন করে সংখ্যায় কমে যাচ্ছি, আর ওরা কিছু না করে সংখ্যায় হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। সংখ্যাধিক্যই যখন যোগ্যতার মাপকাঠি আজকাল তখন আমাদের পরাজয় অনিবার্য"

জগদীশ হাসিয়া বলিলন—"কিন্তু যাই বল ভাই এ যুগে জন্মশাসন না করলে চলা অসম্ভব। আমি অন্তত মরে যেতুম।"

সুরেন্দ্রনাথের বড়ছেলে বিনয় বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা শিগগির এস পিসিমা ডাকছে"

সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে চলিয়া গেলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন জগদীশ-পত্নী শ্রীমতী সবলা দেবী।

সাজে-পোশাকে ভাব-ভঙ্গিতে অতি-আধুনিক।

স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য, তুমি এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছ! তুমি বাড়িতে না থাকলে আমি মিটিংয়ে যাব কি করে—"

"ওহো, একেবারে ভুলে গেছি। চল"

নমস্কারাদি বিনিময়ের পর স্বামীকে লইয়া শ্রীমতী সবলা চলিয়া গেলেন।

বিকাশের দিকে চাহিয়া অবনী বলিলেন—"জন্মশাসন করলে কি হয় তার দু রকম নমুনা পাওয়া গেল আজ! বিকাশ ইলেক্‌শনে হারল, জগদীশ সুখে আছে—"

"কেন তৃতীয় নমুনাও তো দেখলে, ওই সবলা দেবী। বছর বছর ছেলে হলে ও মিটিং করে বেড়াতে পারত কি।"

"জন্মশাসন তাহলে ত্রি-ফলা, তিন রকম ফলের সম্ভাবনা আছে ওতে—"

বিকাশ বলিলেন, "শুকরি মেয়েটিকে কিন্তু ভারি ভাল লাগল। সুরেনের ঠাকুরদা বেড়ে লিখতে পারতেন তো—"

সুরেন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হইয়া অন্দরমহল হইতে ফিরিলেন;

"অবনী গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারবে—"

"তা পারব। হঠাৎ টাকার কি দরকার পড়ল—"

"আমার বউয়ের কাল থেকে ব্যথা ধরেছে। ডাক্তার ডাকতে হবে—"

"ও—"

অবনী বড়লোকের ছেলে। অবিবাহিত। পকেটে সর্বদা টাকা থাকে।

অবিলম্বে পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

"আমি ডাক্তারের কাছে চললুম—। তোমরা বস। চা করতে বলেছি"—সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

অবনী একটি সিগারেট ধরাইয়া রিং করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ জন্মশাসন না করলে যা হয় তাও দেখছি ত্রিফলা। ধর্ম, অর্থ, কাম। আমাদের সুরেনের কথাই ধর। খাঁটি ধার্মিকলোক, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। বারোটি সন্তান যখন কাম ওর চরিতার্থ হয়েছে। অর্থটা যদিও এখন মাইনাসের দিকে চলছে, কিন্তু ওর আটটা ছেলে যদি মানুষ হয়, চারটেও যদি হয়, তাহলে অর্থও হবে—"

চাকর চা লইয়া প্রবেশ করাতে আলোচনা আর বেশী দূর গড়াইল না।

অতি-ছোট গল্প

দীপ-শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন অধীরভাবে কার প্রতীক্ষা করছে। তার আকুল আগ্রহই যেন অচঞ্চল করেছিল তাকে। একটু পরেই ধীরে ধীরে সে কাঁপতে লাগল। এসেছে, হাওয়া এসেছে। কাঁপুনি বেড়ে গেল তার। মনে হতে লাগল হাওয়ার বাহুপাশে আত্মহারা হয়ে পড়েছে সে বুঝি।

দীশ-শিখা। ছেড়ে দাও, ও কি করছ?

হাওয়া। আমাকে ছেড়ে কি থাকতে পারবে তুমি? বিজ্ঞানীরা কি বলেছেন জানো?

দীপ-শিখা। কি?

হাওয়া। আমার মধ্যে না কি অক্সিজেন-নামে একরকম গ্যাস আছে। সেই গ্যাসই না কি মূর্ত করেছে তোমাকে শিখা-রূপে। আমি না থাকলে, তুমিও থাকতে না।

দীপ-শিখা। ইস্—। কি করছ তুমি—

হাওয়ার বেগ বাড়ল। দীপ-শিখা কাঁপতে লাগল অসহায় ভাবে।

ঘরের আর এক কোণে।
"ছিঃ, কি করছ—"

"কি ভণ্ড তুমি! এই জন্যেই তো জেগে আছ!"

"ছাড়, ছাড়। ঘরে আলো রয়েছে, বড্ড লজ্জা করছে আমার—"

"আলোটা নিবিয়ে দাও তাহলে।"

একটি নিটোল সুন্দর মুখ এগিয়ে এল দীপ-শিখার কাছে।

একটি ফুৎকারে নিবে গেল দীপ-শিখা।

"বড্ড জোর হাওয়া আসছে। জানলাটা বন্ধ করে দি?"

"দাও—"

দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল জানলাটা।

নাক

কথিত আছে নাকের জোরেই ক্লিওপেট্রা নাকি বড় বড় বীরদের ঘায়েল করিয়াছিলেন। স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য বীর পাঁচুগোপাল আইচ মহাশয়ও নাকের জন্যই ঘায়েল হইলেন।

শ্রীপাঁচুগোপাল আইচ একটি আপিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। "রাখিলে রাখিতে পার মারিলে কে করে মানা"—এ কথা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহার আপিসে সকলেই তাঁহার ভয়ে তটস্থ। কেবল এক গণেশপ্রসাদ আইচ ছাড়া। আইচ পদবী দেখিয়াই ছোকরাকে পাঁচুগোপালবাবু বাহাল করেন। আইচদের সম্বন্ধে তাঁহার কিছু দুর্বলতা আছে। ইণ্টারভিউ করিবার সময়ও ছোকরাকে তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল। বাটারফ্লাই ছাঁটের গোঁফটা যদিও তেমন পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথাবার্তা, চটপটে চাল-চলন, চমৎকার হাতের লেখা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নামটিও ভালো, গণেশপ্রসাদ আইচ। কিন্তু ক্রমশ তাঁহার মুগ্ধভাবটা কাটিয়া যাইতেছে। ছোকরার ডাক-নাম না কি পিংপং! একদিন লক্ষ্য করিলেন আপিসে ঢিলা পায়জামা চুড়িদার পাঞ্জাবী এবং লখনৌ-শহর-জাত শুঁড়-ওলা নাগরা পরিধান করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, এটা আপিস। তোমার বৈঠকখানাও নয়, শ্বশুরবাড়িও নয়। হয় সাহেবী পোশাক পরে এসো, তা না পার

ভদ্র বাঙালী হলেও চলবে। তার মানে, কাপড়ের ওপর গলাবন্ধ কোট বা ভদ্র কামিজ বা পাঞ্জাবী। ফুটানি করবার জায়গা এটা নয়।”

পিংপং বলিল, “এ সম্বন্ধে কি কোনও আইন আছে?”

শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন পাঁচুগোপালবাবু। তাঁহাকে আইন দেখাইতে আসিয়াছে!

বলিলেন, “এ আপিসে আমার কথাই আইন। যা বললাম, তাই কোরো। নইলে চাকরি থাকবে না”

“এ তো আশ্চর্য কাণ্ড দেখছি”

ছোকরা গজগজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ইহার দিন সাতেক পরে পাঁচুবাবু একদিন সিনেমা দেখিতে গিয়াছেন, হঠাৎ নজরে পড়িল তাঁহার ঠিক সামনের সীটেই পিংপং বসিয়া আছে। সিগারেট খাইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া জ্বলন্ত-সিগারেট-সুদ্ধ হাতটা তুলিয়া অভিবাদন করিল, কিন্তু সিগারেটটা ফেলিয়া দিল না। তাঁহার নাকের উপর ধোঁয়া ছাড়িয়া একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে ছোকরা যথার্থই আইচ-কুল-কুলাঙ্গার।

পরদিন আপিসে গিয়াই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

“দেখ, তোমাকে টেম্পোরারি হ্যাণ্ড হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কাজ-কর্ম চাল-চলন কিছুই আমার পছন্দ নয়, তুমি অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখো, আমরা তোমাকে পার্মানেণ্ট করব না”

পিংপং স্থিরদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে একটি সুবাসিত রঙীন রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও মুখটা মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, “অনেক ধন্যবাদ—”

নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাঁচুগোপাল গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইহার দিন তিনেক পরে পিংপং যাহা করিল তাহা আরও বিস্ময়জনক। আপিসে আসিয়া বলিল, "আমি আর একটি চাকরির যোগাড় করেছি। সেটা এ চাকরির চেয়ে ভালো। মাইনে প্রায় দেড়গুণ, কাজ অর্ধেক। সাহেবী ফার্ম। তবে আপনি রেকমেণ্ড না করলে সে চাকরি হবে না। আমি দরখাস্তটা লিখে এনেছি, আপনি রেকমেণ্ড করে দিন—"

ছোকরার স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন পাঁচুগোপাল।

"সরি, আমি রেকমেণ্ড করতে পারব না"

ভ্রূযুগল কপালে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পিংপং বলিল, "সে কি !"—

"না আমি মিছে কথা লিখতে পারব না"

পিংপং গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পরদিন আপিসেও আসিল না। পাঁচুগোপাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু দিন তিনেক পরেই আবার তাঁহাকে নিশ্বাসটি টানিয়া লইতে হইল। তিন দিন পরে লম্বা খামে তাঁহার নামে একটি পত্র আসিল। খামটি খুলিয়া দেখিলেন পিংপং সেদিন যে দরখাস্তটি রেকমেণ্ড করাইবার জন্য আনিয়াছিল সেইটি রহিয়াছে আর রহিয়াছে মেয়েলী-হাতের লেখা একখানি চিঠি।

ভাই পাঁচু,

আমাকে আশা করি এতদিনে সম্পূর্ণ ভুলে গেছ। ভোলাটাই স্বাভাবিক, যদি ভুলে থাক, তোমাকে দোষ দেব না। আমাকে অনেকেই ভুলেছে। তোমার হাত ধরেই আমি সর্বপ্রথম অকূলে ভেসেছিলাম, তুমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছ, কিন্তু আমি আর কূলে উঠতে পারি নি। অনেকে আবার এসে আমার হাত ধরেছে,

আবার ছেড়ে দিয়ে চলেও গেছে। এমনিই হয়। পুরুষ মানুষরা পদ্মপত্রের মতো, তাদের গায়ে বা মনে জল দাঁড়ায় না, এমন কি চোখের জলও নয়। তুমি এখন মানী পদস্থ ব্যক্তি হয়েছ, আমার সঙ্গে তোমার যে কি সম্পর্ক ছিল তা সবাই ভুলে গেছে, এমন কি তুমিও ভুলে গেছ। কি সব বাজে কথা লিখলুম, আসল যে কথাটা বলবার জন্যে এই চিঠি লিখছি সেইটেই আগে বলি। পিংপং আমার ছেলে। ওর বাবা কে তা আমি হলফ করে বলতে পারব না, কিন্তু আমার ধারণা তুমিই ওর বাবা, তাই ওর আইচ পদবী দিয়েছি। তাই তোমার আপিসে ও কাজ পেয়েছে শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। এখন শুনছি ওকে নাকি তোমার তেমন ভালো লাগে নি, তাই ওকে নোটিশ দিয়েছ। আর একটা আপিসে ও চাকরি যোগাড় করেছে, কিন্তু তুমি সুপারিশ না করলে সে চাকরি ওর হবে না। দরখাস্তটি এই সঙ্গে পাঠালুম, দয়া করে একটু সুপারিশ করে দিও। ওই আমার একমাত্র সন্তান, একমাত্র ভরসা। ও যদি রোজগার করতে না পারে আমাকে উপবাস করতে হবে। কারণ আমি এখন অসমর্থ, আর রোজকার করতে পারি না। আমার আন্তরিক ভালবাসা নিও। আর দয়া করে একটু সুপারিশ করে দিও লক্ষ্মীটি। ইতি—
তোমারই সুশী।

নীচে ঠিকানা দেওয়া ছিল। হাড়কাটা গলির ঠিকানা।

পত্রটি পাঠ করিয়া পাঁচুগোপাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের সামনে হইতে ত্রিশ বৎসরের যবনিকা সরিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—দ্বিতলের একটি জানালায় ষোড়শী সুশীলা দাঁড়াইয়া আছে। পানের মতো মুখখানি, তাহার উপর বাঁশীর

মতো নাকটি। প্রথমে নাকটাই তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল, নাক দেখিয়াই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মনে পড়িল—ওই-নাক, সই-নাক, মৈনাক, কই-নাক প্রভৃতি মিল মিলাইয়া দীর্ঘ একটি কবিতাও তিনি লিখিয়াছিলেন। সব মনে পড়িল। দরখাস্তটির দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর জোর কলমে সুপারিশ করিয়া দিলেন।

দিন দুই পরে সন্ধ্যার পর পাঁচুগোপাল হাড়কাটা গলিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া সুশীলার বাড়িটা বাহির করিলেন। একটি স্থবিরা চাকরাণী বাহির হইয়া আসিল।

"সুশীলা কি এইখানে থাকে—"

"হ্যাঁ"

"পিংপং বাড়িতে আছে—"

"না তিনি বেরিয়ে গেছেন। রাত বারোটার আগে ফিরবেন না"

"সুশীলাকে বল পাঁচুগোপালবাবু এসেছেন—"

চাকরাণী একটু পরেই আসিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। পাঁচুগোপালবাবু দেখিলেন একটি অবগুণ্ঠনবতী প্রৌঢ়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

তিনি অবাক হইয়া গেলেন।

"এ কি সুশীলা, ঘোমটা কেন—! ঘোমটা খোল"

সুশীলা ক্ষণকাল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ঘোমটাটা সরাইয়া দিল। পাঁচুগোপালবাবু আঁতকাইয়া উঠিলেন। সে নাক নাই, নাকের জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গর্ত !

বিশ্বাস মশাই

আমরা আগ্রার তাজমহল দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আগ্রার বাঙালী বন্ধুবান্ধবেরা বললেন, "এতদূর যখন এসেছেন তখন হরিদ্বারটাও দেখে যান।" আমাদের তত ইচ্ছে ছিল না। কারণ, প্রথমত, টাকা কমে গিয়েছিল; দ্বিতীয়ত, অত বড় পরিবার এবং লটবহর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করবার আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমাদের দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবই ছিল, আর প্রত্যেকের বিবিধ রকম বায়নাক্কা। কেউ ঝাল পছন্দ করে, কেউ করে না; কারও বাথরুম না হলে স্নানের সুবিধা হয় না; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ম্লেচ্ছাচার পছন্দ করেন না; ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় তাঁদের; দু-তিনটে ছেলে অসুখে পড়ে গেল। আর টাকা তো জলের মতো খরচ হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আগ্রার বন্ধুরা একেবারে না-ছোড়। টাকা কমে গিয়েছে শুনে তাঁরা কিছু টাকা ধার দিতেও উদ্যত হলেন। তাঁদের বললাম, "হরিদ্বারে কাউকে তো চিনি না। এখানে আপনারা ছিলেন—কোনো অসুবিধা হয়নি।"

একজন বন্ধু বললেন, "হরিদ্বারেও হবে না সেখানে বিশ্বাস মশাই আছেন—"

"বিশ্বাস মশাই কে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

যদিও প্রত্যেকটি লোক অসুবিধা ভোগ করছিল, তবু হরিদ্বারের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠল সবাই। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শেষটা বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে যাওয়াই স্থির করলাম। হুজুকে-বাঙালী আর কাকে বলে!

দুই

হরিদ্বারে পৌঁছলাম ভোরে। তখনও অন্ধকার ভাল করে কাটে নি। জানলা দিয়ে খুব আশাভরে মুখ বাড়ালাম, ভাবলাম কোনও অপরূপ দৃশ্য বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ড টেনে নিতে হল। বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে শীত। প্যাসেঞ্জার-কুলি ভিজে ভিজেই ছুটোছুটি করছে প্যাচপেচে প্ল্যাটফর্মে। দমে গেলাম বেশ। মালপত্র আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমাকেও নামতে হবে এর মধ্যে। বিদেশে কুলিরাই বন্ধু। তাদেরই সাহায্যে নেমে পড়লাম অবশেষে। নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। কোথায় যেতে হবে, কোথায় আশ্রয় মিলবে, কিচ্ছু জানা ছিল না। অবিলম্বে কয়েকটা পাণ্ডা এসে ঘিরে ধরল এবং কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, পিতামহের নাম কী, কোনও পাণ্ডা ঠিক করা আছে কি না, প্রভৃতি প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলল সকলকে। কী করব দিশাহারা হয়ে ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বাস মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একটা কুলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, বিশ্বাস মশাই কোথা থাকেন জান?"

"ওই তো বিশ্বাসবাবু। এ বিশ্বাসবাবু, এ বিশ্বাসবাবু ইধর আইয়ে—"

কুলির ডাকে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চেহারা দেখে তো চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। এরই ভরসায় আমরা এসেছি! এ যে ভিখারী একটা! পরনে আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেডস। মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে, তাও কেমন যেন খাপছাড়া গোছের, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, এখানে চারটি ওখানে চারটি ছড়ান-ছড়ান। রংটি কুচকুচে কালো। হাত দুটি জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু অপরূপ। যে বিনয় ভদ্রতা এবং স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছিল সে-চোখের দৃষ্টি থেকে তা আজকাল দুর্লভ। অথচ ভদ্রলোকের বেশবাস এমন কুৎসিত কেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

"আমাকে ডাকছিলেন ?"

নমস্কার করে বললাম, "আগ্রার মতিবাবু আপনার খোঁজ করতে বলে দিয়েছিলেন। আমরা এখানে নতুন এলাম তো, কিছুই জানি না, কাউকে চিনিও না—"

"তা বেশ চলুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

তারপর কুলির দিকে ফিরে বললেন, "কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ওখানে নিয়ে চল—"

বিশ্বাস মশাইয়ের পিছু পিছু আমারা সার বেঁধে চলতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। না নিলে ওর জন্যে আর একটা কুলি করতে হত। কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আস্তানায় যখন পৌঁছলাম, তখন কুলিরা পয়সা চাইতে লাগল। সাধারণত কুলিরা যা করে বিদেশী দেখে, খুব বেশী চাইতে লাগল। আমার কাছে দশ টাকার নোট ছিল, খুচরো পয়সা ছিল না, তাই বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই বললেন, "নোটটা আমাকে দিন—"

অচেনা লোককে নোটটা দিতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না বলে দিলাম। বিশ্বাস মশাই কুলিদের দিয়ে জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়ে বিছানাপত্র পাতিয়ে আমাদের খালি কুঁজো দুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুলিরাও তাঁর পিছু পিছু গেল। তারপর যা ঘটল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। কুলিদের গোলমালে ব্যাপারটা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। গঙ্গার কলকলধ্বনি শোনা গেল। নদী যে কলকলধ্বনি করে এ-কথা কেতাবেই পড়েছিলাম, কানে শুনি নি কখনও। কুম্ভকর্ণের বাড়িটা ঠিক গঙ্গার উপরই, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, যেন একটি তন্বী কিশোরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে। গঙ্গার এমন রূপ আর কখনও দেখি নি। খুব কম চওড়া, নীলাভ জল, অত্যন্ত স্বচ্ছ, নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। আর বড় বড় মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ হরিদ্বারের মহিমা যেন চোখে পড়ল, গম্ভীর বিরাট কিছু নয়, সজীব, সতেজ চিরনবীন।

"খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথা করবেন আপনারা—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বিশ্বাস মশাই ফিরে এসেছেন। নোটটি ভাঙিয়েছেন তিনি, কুলিপিছু দু-আনার বেশী দেন নি, কিছু টাকার খুচরো করে এনেছেন, এমন কি চার-আনার আধলা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। বললেন, "অনেক ভিকিরিকে দিতে হবে কি না।" পাই পয়সা হিসেব দিলেন, তারপর বললেন, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী করবেন বলুন—"

"কী ব্যবস্থা আছে এখানে?"

"দোকান থেকে কিনে খেতে পারেন। লুচি তরকারি পাওয়া যেতে পারে, ভাতও পাবেন একটা হোটেলে। কিন্তু ও-সব কি আপনারা খেতে পারবেন? দামও নেবে, তৃপ্তিও পাবেন না।"

আমার স্ত্রী বললেন, "এখানে রান্না করার ব্যবস্থা হয় না? আমাদের স্টোভ আছে—"

"হ্যাঁ মা, খুব হয়। আমি একটা তোলা উনুনেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি—"

"তাই হক তাহলে। খিচুড়ি আর কিছু ভাজাভুজি করা যাক, বৃষ্টিও নেবেছে, জমবে ভাল।"

সকলে এই ব্যবস্থাতেই রাজী হয়ে গেল।

আমার শালী প্রশ্ন করলেন, "মুগ ডাল পাওয়া যাবে?"

"যেতে পারে। তবে এখানে অড়র বুটই বেশী চলে। আমি চেষ্টা করে দেখব।"

মুগের ডাল এখানে পাওয়া যায় না বলে বিশ্বাস মশাই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। এটা যেন তাঁরই অপরাধ।

"মুগ না পাওয়া গেলে মশুরি আনবেন। খাঁড়ি মশুরি হলেই ভাল হয়—"

"চেষ্টা করব। খুবই চেষ্টা করব।"

"তরকারি কি পাওয়া যায় এখানে?"

"আলু, নেনুয়া, ঝিঙে। পেঁয়াজও পাওয়া যাবে।"

"পটল?"

আবার কুণ্ঠিত হলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, পটল এখানে পাওয়া যাবে না।"

"বেগুন?"

আরও কুণ্ঠিত হলেন।

"না, বেগুনও নয়।"

হাত কচলাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"লঙ্কা পাওয়া যাবে নিশ্চয় ?" আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"তা যাবে, তা যাবে।"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফোঁস করে উঠলেন আমার বোনটি।

"লঙ্কা পেয়ে আর কাজ নেই। বৌদি খিচুড়িটি ঝালে পুড়িয়ে দেবে তাহলে।"

"তোকে আমি সাবু করে দেব, তাই খাস।"

কিন্তু-কিন্তু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বাস মশাই।

আমি তাঁকে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে বললাম, "যা পান কিনে আনুন। আমি ততক্ষণ স্টোভ জ্বেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

দুটো ঘর নিয়েছিলাম আমরা। একটা ঘরে বাবা মা ছিলেন।

মা বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার বাবা একটু গঙ্গাজল চাই!"

বিশ্বাস মশাই কখন যে কুঁজো দুটি ভরে এনেছিলেন টের পাই নি। বললেন, "দু কুঁজো জল আমি এনে রেখে দিয়েছি ও-ঘরে।"

"ও কুঁজো বাবা শতেক জাতে ছুঁয়েছে। একটু শুদ্ধভাবে যদি—"

"আচ্ছা আনব মা। নতুন কলসী কিনে ভরে আনি তাহলে—"

বিশ্বাস মশাই চলে গেলেন।

আমি স্টোভ জ্বেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিলাম।

গিন্নী ছোট ছেলের কপালে হাত দিয়ে বললেন, "এর তো বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি—"

মন্তব্য করলাম, "আগ্রাতেই তো ওর জ্বর হয়েছিল। লাফিয়ে তো চলে এলে।"

"আমি লাফিয়ে এলাম, না তুমি লাফিয়ে এলে? পরের ঘাড়ে দোষ চাপান তোমার কেমন একটা স্বভাব—"

দাম্পত্য কলহের উপক্রম হল।

ছোট ছেলেই থামিয়ে দিলে সেটা।

"না বাবা, আমার কিচ্ছু হয়নি। র‍্যাপার মুড়ে শুয়েছিলাম কিনা তাই কপালটা গরম হয়েছে—"

"খুব হয়েছে, শুয়ে থাক এখন।"

মায়ের ধমক খেয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বিশ্বাস মশাই বাজার থেকে ফিরলেন জিনিসপত্র নিয়ে। দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার শালীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "খাঁটি মুশুরিই পেয়েছি মা। বেশ ভাল ডাল।"

তাঁর পিছনে দেখলাম পাণ্ডাদের একটা ছোঁড়া নতুন কলসীতে করে গঙ্গাজলও নিয়ে এসেছে মায়ের জন্যে। বিশ্বাসমশাই আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, "আমিই নিয়ে আসতুম গঙ্গাজলটা, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। কর্তা-মা যদি আপত্তি করেন, তাই ওকেই বললাম নিয়ে আসতে। গোটা চারেক পয়সা দিলেই চলবে।"

বিশ্বাস মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সপসপে ভিজে কাপড়ের কোঁচাটা নিঙড়ে জল বার করতে লাগলেন। কামিজের সামনের দিকটাও নিঙড়ে ফেললেন।

চা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, "চা খান বিশ্বাস মশাই।"

"দেবেন? বেশ দিন—"

একটা গ্লাসে চা দিলাম। তিনি একধারে সসংকোচে বসে চা খেলেন।

গিন্নী বাজারের জিনিস দেখে বললেন, "গুঁড়ো হলুদ আর লঙ্কা এনেছেন, কিন্তু ও তো ধুলোয় ভরতি, ওতে খিচুড়ির রং তো ভাল হবে না—"

বিশ্বাস মশাই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

"হ্যাঁ, সেকথা আমারও মনে হয়েছিল। আচ্ছা, দেখছি—"

পাণ্ডার সেই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, বিশ্বাস মশাই তার কানে কানে কী বললেন, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দেখলাম তিনি ছোট একটি শিল-নোড়া, কিছু গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসেছেন।

আমার শালী বললেন, "ওরে বাবা, ওসব এখন বাটবে কে?"

"আমি বেটে দিচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে—"

বিশ্বাস মশাই এক কোণে বসে বাটনা বাটতে লেগে গেলেন।

বাটনা বেটে তোলা উনুনটা নিয়ে এলেন তিনি। বাজারে যাওয়ার সময়েই সেটাতে আঁচ দিয়ে গিয়েছিলেন। গিন্নী খুশী হলেন খুব। বেশ গনগনে আঁচ উঠেছে।

শালী বললেন "আমি আলু-ছেঁচকি করব। ঊষা, তুই ভাই আলুগুলো কুটে ফেল—। ও হরি বঁটিই যে নেই—"

"এনে দিচ্ছি—"

বিশ্বাস মশাই পাণ্ডাদের কাছ থেকে বঁটি যোগাড় করে আনলেন।

আলু কোটা হলে আবিষ্কৃত হল ছেঁচকি হওয়ার পথে আর একটি

অন্তরায় বিদ্যমান। পাঁচ-ফোড়ন নেই। বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন।

তারপর স্নান করার পালা। গঙ্গার স্রোত এত বেশি যে, সেখানে নেবে দাঁড়ান পর্যন্ত যায় না। একটা শিকল্ আছে সেইটে ধরে কোনরকমে একটা কি দুটো ডুব দেওয়া যায়। বিশ্বাস মশাই সবাইকে একে একে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন। তারপর দল-বেঁধে সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আনলেন।

এসব সেরে বেশ ক্ষিধে পেয়ে গেল সকলের। তখনও কিন্তু রান্না চড়ে নি। ঠিক হল কিছু গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নেওয়া যাক জলখাবার হিসেবে। বিশ্বাস মশাই আবার গেলেন সে-সব ভাজিয়ে আনতে। তাঁকে পই-পই করে বলে দেওয়া হল, তিনি যেন নিজের সামনে ভাজিয়ে আনেন সব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আনব বই কি। নিজের সামনে ভাজিয়ে আনব।"

বৃষ্টির বেগটা কমেছিল কিন্তু টিপ-টিপ করে করে পড়ছিল তবু। বিশ্বাস মশাই বেশ ভিজেই ফিরলেন।

বললাম, "বিশ্বাস মশাই আপনি কাপড়টা জামাটা ছেড়ে ফেলুন না।"

বিশ্বাস মশাই নির্বিকার। খাবারের ঝুড়িটা খুলতে লাগলেন। বললেন, "খাঁটি ঘিয়ে ভাজিয়ে এনেছি। আচারও বেশি করে এনেছি একটু—"

"এনেছেন বেশ করেছেন। কাপড়-জামাটা ছাড়ুন—"

বিশ্বাস মশাই হেসে বললেন, "ও একেবারে রাত্রে শোবার সময়

ছাড়ব। শুকনো জামা-কাপড় পরলে আবার এখুনি তো ভিজে যাবে।”

বুঝলাম, এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। কারণ পরমুহূর্তেই বাবা বললেন, তাঁর নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, এখানে পাওয়া সম্ভব কি ?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বাস মশাই।

“হ্যাঁ, সম্ভব বই কি। র-মাদ্রাজী, পরিমল দু-রকমই পাওয়া যাবে। কোনটা আনব বলুন—”

বাবা র-মাদ্রাজী আনতে বললেন। র-মাদ্রাজী নস্যি এনে বিশ্বাস মশাই পা-টি মুড়ে যেই বসেছেন অমনি আমার গিন্নী বললেন, “ছায়া, চিরুনিটা যে তোর হাতে দিলুম আগ্রা হোটেলে—”

ছায়া আমার শালী। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, “আমার হাতে কখন দিলে আবার। দিয়ে থাকলে ওই অ্যাটাচিতেই রেখেছি—”

“কই এতে তো নেই !”

বাক্স, সুটকেশ, তোরঙ্গ সব খোঁজা হল। চিরুনি নেই।

সুতরাং বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন চিরুনি কিনতে, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে ছুটলেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেট আনতে দিলাম আমার ছোট ছেলেটার জ্বর যদি বেড়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব এই বিদেশে। সমস্ত এনে দিলেন বিশ্বাস মশাই।

খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস মশাইকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। খাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বাস মশাই বললেন, “একটু অপেক্ষা করুন। ভাল ঘি আছে আমার একটু, নিয়ে আসি—।” দৌড়ে চলে গেলেন এবং ভালো গাওয়া ঘি নিয়ে এলেন একটা শিশি করে। বললেন, কলকাতা

থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি দিয়ে গিয়েছেন এটা তাঁকে। বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। বিশ্বাস মশাই বসে রইলেন একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

"আপনিও যান না, একটু বিশ্রাম করে নিন।"

বিশ্বাস মশাই সসঙ্কোচে বললেন, "আপনাদের যদি কোনও দরকার হয়—"

"না, আর কিছু দরকার হবে না। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন গিয়ে। বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।"

চলে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

বিকেলে এলেন একটি লোক সঙ্গে করে। বললেন, "আপনারা কি হৃষিকেশ, লছমনঝোলা যাবেন। যদি যান, তাহলে বাসে করেই যাওয়া ভাল। ইনি আমার চেনা বাসওলা। একটা ছোট বাস যদি রিজার্ভ করে নেন, ইনি সস্তায় করে দেবেন—"

বললাম, "যেতে তো খুবই লোভ হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তো দেখছেন, এখানে আপনি ছিলেন তাই সামলে দিলেন, কিন্তু সেখানে—"

"যদি বলেন সেখানেও আমি যাব।"

খবরটি পাওয়ামাত্র চনমন করে উঠলো সবাই।

বাবা বললেন, "এতদূর এসে যদি না দেখে ফিরে যাই তাহলে আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা হয়ত আবার আসতে পার কিন্তু আমরা আর পারব না।"

এ-যুক্তি অকাট্য। একটা কুইনিনের বড়ি খেয়ে ছেলেটার জ্বরও কমে গিয়েছিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হল।

হৃষিকেশ-লছমনঝোলার বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না, কারণ তা বর্ণনা করা যাবে না। হৃষিকেশ-লছমনঝোলায় বিশ্বাস মশাই যা করেছিলেন তা-ও প্রায় অবর্ণনীয়। আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বলে আমার পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছিলেন তিনি। হৃষিকেশের সরাইখানায় বিশ্বাস মশাইকে একটু নির্জনে পেয়েছিলাম রাত্রিবেলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার দেশ কোথা বিশ্বাস মশাই। বাংলা দেশে নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, বাংলা দেশে বই কি। তবে সে-দেশ ছেলেবেলায় ছেড়ে এসেছি।"

"কোথা বাড়ি ছিল আপনার ?"

"তা আর না-ই শুনলেন। আমি সামান্য লোক—"

কাঁচুমাচু হয়ে থেমে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, না, বলুন শুনি।"

"আমার পরিচয় দেবার মত নয়। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি নি, লেখাপড়া পর্যন্ত শিখি নি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

সসঙ্কোচে থেমে গেলেন।

"বাংলা দেশের কথা মনে আছে আপনার ?"

"খুব বেশি নেই। তবে একটি ছবি মনে আছে। ছোট একটি পুকুর, পুকুরের পাড়ে তালগাছ, নারকেল গাছ। পুকুরের জল কুচকুচে কালো, সবুজ পানায় ঢাকা, ঘাটে একটি বউ কলসী ভাসিয়ে

চান কচ্ছে, টুকটুকে লাল গামছা তার হাতে। হৃষিকেশ হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়েও ও-ছবি আমার বেশি ভাল লাগে—"

"আপনি তো কবি-লোক দেখছি—"

কুণ্ঠিত হাসি হেসে বিশ্বাস মশাই বললেন, "আমি সামান্য লোক। তবে আমার দাদা একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁর কথা বলতেও লজ্জা করে আমার। আমি তাঁর ভাই হওয়ার উপযুক্ত নই।"

"কে আপনার দাদা বলুন তো—"

"কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস। আমি দাদার নামের মর্যাদা রাখতে পারি নি।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"আপনি কি করেন এখানে—"

"এই যাত্রীদের, বিশেষ করে বাঙালী যাত্রীদের, সেবা করি। এ ছাড়া আর কী করবার যোগ্যতা আছে বলুন—"

"বাসা বলে তো আমার কিছু নেই। ট্রেনগুলো অ্যাটেণ্ড করি, যদি কোনো যাত্রী আসে। প্ল্যাটফর্মেই থাকি অধিকাংশ সময়। আর তা না হলে ওই কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার বাড়ির বারান্দায়। যাত্রীদের সেবা করাই কাজ তো—"

পাশের ঘরে আমার ছোট ছেলেটার গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন বিশ্বাস মশাই।

"খোকন উঠেছে, ওর জন্যে দুধ যোগাড় করেছি একটু, গরম করে খাইয়ে আসি—"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

ফেরবার সময় হরিদ্বারে বিশ্বাস মশাই এলেন আমাদের ট্রেনে

তুলে দেবার জন্য। অনেক রাত হয়েছিল। নিজ হাতে তিনি আমাদের বিছানাপত্র পেতে দিলেন, জিনিসগুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে দিলেন, রাত্রের খাবার আলাদা করে বেঁধে দিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিকে চেয়ে। মনে হল, তিনি যেন অতি প্রিয় পরিজনদের বিদায় দিতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, গার্ড সাহেব বাঁশি বাজালেন।

হঠাৎ আমার কী মনে হল, হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম—

"বিশ্বাস মশাই, শুনুন—"

বিশ্বাস মশাই এগিয়ে এলেন।

"এইটে রেখে দিন, সামান্য কিছু—"

একখানা দশ টাকার নোট বার করে তাঁর হাতে দিলাম।

"অ্যাঁ, একী, আপনি আমাকে টাকা দিলেন, টাকা দিলেন!"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

দেখলাম, বিশ্বাস মশাই নোটটি হাতে করে অসহায়ভাবে চেয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

পুত্র

নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফস্বলে টুর করতে বেরিয়েছেন। এই প্রথম বেরিয়েছেন তিনি। প্রতিভাবান বাঙালী যুবক, অল্প কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সসম্মানে। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে স্টেশনে এসেছেন প্রবীণ অবাঙালী সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস (ইনি খাঁটি সাহেব), থানার দারোগা, কয়েকজন কনেস্টবল। আর এসেছেন জিতেন্দ্রনাথ বসু, সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কেরানী একজন। স্টেশনের বাইরে তিনখানি মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। একটি এস ডি ও সাহেবের, একটি এস পির। তৃতীয় কারটি স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী যুগলরাম মারোয়াড়ীর। এই তৃতীয় কারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ এটি পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। সাধারণত বিয়ের সময় বরের গাড়ি যেভাবে সাজানো হয়, এটি সেইভাবে সাজানো। এ গাড়িটি চেয়ে এনেছেন কেরানী জিতেন্দ্রনাথ বসু।

...ট্রেন একটু লেট আসছে। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছেন সবাই। ছোট শহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আগমনও একটা হৃৎস্পন্দনকর ঘটনা। স্টেশন মাস্টার টিকিট কালেক্টার পর্যন্ত একটু যেন সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তখন ইংরেজের আমল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ ও প্রতীক।

লাল-পাগড়ি পুলিস, দারোগা, এস পি, এস ডি ও এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে প্ল্যাটফর্মে সমবেত যাত্রীরা পর্যন্ত সহজে নিশ্বাস নিতে পারছেন না। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে আধময়লা-জামা কাপড়-পরা জিতেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সসঙ্কোচে। তাঁর মনিব সাব ডিভিশনাল অফিসারের সামনে প্রগলভতা প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু তাঁর নাচতে ইচ্ছে করছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং—ঘণ্টা পড়ল। ট্রেন আসছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ট্রেন। এস ডি ও, এস পি এগিয়ে গেলেন প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে। জিতেনবাবুও দৌড়ে গেলেন, কিন্তু খুব কাছাকাছি যেতে পারলেন না। মনিবের সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নাবলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। কচিমুখ, নেহাত ছেলেমানুষ। প্রতিভার দীপ্তি কিন্তু বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ মুখ থেকে। নেবেই এস ডি ও এবং এস পির সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন তাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। কিছু দূর এসেই জিতেনবাবুকে দেখতে পেলেন তিনি। এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। অবাক হয়ে গেল সবাই।

এস ডি ওর দিকে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, "ইনি আমার বাবা—।" এস ডি ও এই ধরনের একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা শুনে নমস্কার করলেন জিতেনবাবুকে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ কেরানীর কাছে সর্বসমক্ষে মাথা নোয়াতে হল বলে ক্ষুব্ধও হলেন একটু।

খাঁটি সাহেব এস পি বাঙালী-মহলে-প্রচারিত এ খবরটা জানতেনই না। বেশ অবাক হলেন। কিন্তু টুপিটা ঈষৎ তুলে শিষ্টাচার সম্মত অভিবাদন জানাতে কসুর করলেন না।

জিতেনবাবু বললেন, "আমি গাড়ি এনেছি—"

"ও—"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

"জাস্ট এ মিনিট সার—"

এস পি তাঁকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলেন একপাশে। এস ডি ও সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

এস-পি বললেন, "আপনি আমার ওখানে চলুন। এখানে ভালো ডাক বাংলো নেই। আমার বাংলোতেই সব ব্যবস্থা করেছি আপনার। ডিনার ইজ ওয়েটিং—" এস-ডি-ও বললেন, "এক্সকিউজ মি, আর একটা কথাও বিবেচনা করবার আছে। মিস্টার বোস আমার আপিসের একজন ক্লার্ক। একজন সাব-অর্ডিনেট ক্লার্কের বাড়িতে আপনার ওঠাটা অফিসিয়াল দৃষ্টিতে একটু অশোভন হবে না কি? জানেনই তো আজকাল যিনি কমিশনার, অফিসিয়াল ফর্মের দিকে তাঁর খুব কড়া নজর।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর বাবাকে গিয়ে বললেন সে কথা। জিতেনবাবু বললেন, "ও তাই না কি। তাহলে যাও তুমি ওঁদের সঙ্গেই। কমিশনার সাহেব সত্যিই খুব কড়া লোক। হয়তো—না থাক, ওদের সঙ্গেই যাও তুমি।"

এস পি সাহেবের গাড়িতে চড়ে চলে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তাঁর পিছু পিছু এস ডি ও সাহেবও গেলেন।

পুষ্পে পত্রে সজ্জিত যুগল মারোয়াড়ীর গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল।

জিতেনবাবু ড্রাইভারকে গিয়ে বললেন, "একটা জরুরি দরকারে ওকে পুলিস সাহেবের সঙ্গে চলে যেতে হল। তোমার গাড়ির আর দরকার হল না। তুমি যাও—"

যুগলবাবুর গাড়িও চলে গেল।

জিতেনবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর হেঁটে হেঁটেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন তিনি।

অতিশয় ছোট বাড়ি তাঁর, গলির গলি তস্য গলির মধ্যে। তবু এই বাড়িটিকেই যথাসাধ্য সাজিয়েছিলেন তিনি। চুনকাম করিয়েছিলেন। বাড়ির সামনেটা দেবদারু পাতা আর রঙীন কাগজের শিকল দিয়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন। একটা লাল শালুর উপর সাদা অক্ষরে 'স্বাগত' লিখেও টাঙিয়ে দিয়েছিলেন বারান্দার সামনে। দুচারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই উপলক্ষে।

জিতেনবাবু যখন ফিরে এলেন তখনও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুরা বসে ছিলেন।

"সুকু আসতে পারলে না। একটা জরুরি দরকারে পুলিস সায়েব টেনে নিয়ে গেল তাকে"

"তাই না কি—"

হতাশ হলেন দু-একজন, কেউ কেউ অবাক হলেন, মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করলেন দু-একজন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেলেন একে একে।

সবাই চলে যাবার পর জিতেনবাবু চুপ করে বসে রইলেন

বারান্দার উপর খানিকক্ষণ। তিনি বিপত্নীক। ওই সুকুমারই তাঁর একমাত্র সন্তান। বড় আশা করেছিলেন সে এসে তার কাছেই উঠবে। কিন্তু এল না।

দুই

গভীর রাত্রি থমথম করছে চতুর্দিকে। জিতেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

"বাবা—বাবা—"

দুয়ারের কড়া সশব্দে নড়ে উঠল।

তড়াক করে উঠে বসলেন জিতেনবাবু।

এতরাত্রে কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে কে! তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাটটা খুলে দিলেন।

"এ কি, সুকু—!"

"আমি এইখানেই চলে এলাম। কমিশনার সায়েব যা-ই মনে করুক, আমি তোমার কাছেই থাকব—"

জড়িয়ে ধরলেন তাকে জিতেনবাবু। কেঁদে ফেললেন।

"এতরাত্রে কি করে এলি তুই—"

"হেঁটেই চলে এলাম।"

রূপ-রূপান্তর

কোলকাতা থেকে মনিহারী যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে গাড়ি বদলাতে হবে। সাহেবগঞ্জে ঘাট-গাড়ি পাওয়া যায়, সেই গাড়িতে চড়ে যেতে হবে সকরিগলি ঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে চড়ে যেতে হবে মনিহারী ঘাটে। মনিহারী ঘাট থেকে মনিহারী যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যাবে।

সাহেবগঞ্জে নেবে দেখলাম ঘাট-গাড়ি তখনও প্ল্যাটফর্মে আসে নি। কুলি বললে গাড়ি 'সাইডিং'য়ে লাগানো আছে। সেখানে গিয়েই চড়া ভালো, কারণ সবাই সেইখানে গিয়েই চড়ছে। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসবার আগেই ভরতি হয়ে যাবে। সে আমাকেও সাইডিংয়ে গিয়েই চড়বার পরামর্শ দিলে। গিয়ে দেখলাম থার্ড ক্লাশ প্রায় ভরতি হয়ে গেছে। একটি মাত্র ইণ্টার ক্লাস (তখন ইণ্টার ক্লাস উঠে যায় নি) আর তার ভিতরে দাড়িওলা ভীষণ-দর্শন লোক বসে আছেন একজন। দ্বিতীয় আর কোনও লোক নেই। কপাট খুলে ঢুকতে গেলাম, কপাট খোলে না।

বললাম, "কপাটটা খুলুন মশাই।"

"আমি তো কপাট লাগাই নি, আমি জানলা গলে ঢুকেছি, আপনিও পারেন তো ঢুকুন।"

মহামুশকিলে পড়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্ম নেই, অত নীচু থেকে জানলা গলে ঢোকা অসম্ভব মনে হল আমার পক্ষে। কুলিটা বললে, "আপনি বাবু আপনার এই ট্রাঙ্ক আর বিছানার উপর দাঁড়িয়ে ওই হাতলটা ধরে ঝুলে পড়ুন। আমি পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছি, ঠিক উঠে যাবেন—"

তাই করেই উঠলাম। কনুয়ের কাছটা একটু ছড়ে গেল। আমি যখন ছিঁচড়ে জানলা গলে উঠছিলাম তখন ওই দাড়িওলা ভদ্রলোক এতটুকু সাহায্য করেন নি, আমাকে যদি একটু ধরতেন কনুইটা হয়তো জখম হত না। একটি বেঞ্চে নিজের জায়গাটা দখল করে বসে তাঁর দিকে চাইলাম একবার। দেখলাম তাঁর চক্ষু দুটি অগ্নি বর্ষণ করছে। মনে হল এ রকম পাজি লোক আর দেখি নি। সমস্ত কামরাটা একলাই দখল করে থাকতে চায়।

একটু পরেই আর একদল যাত্রী এসে হানা দিলে আবার। আমাকে যে কুলিটা তুলে দিয়ে গেছে দেখলাম সে-ই এসেছে আবার এদের মাল-পত্র নিয়ে। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী সঙ্গে গুটি তিনেক ছোট ছেলে। একটি ছ-সাত বছরের, একটি বছর চারেকের, আর ছোটটি বছর দুয়েকের বেশী হবে না। এদের পক্ষে জানলা গলে ঢোকা একেবারে অসম্ভব। কুলিটা আমার দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাবু ছেলে দুটোকে তুলে নিন। তারপর আমি ভিতরে ঢুকে এঁদের টেনে তুলছি—"

দাড়িওলা ভদ্রলোক এতক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে দেখছিলেন এদের দিকে। হঠাৎ স্বগতোক্তি করলেন—"যত ভাবি একা থাকব ততই জড়িয়ে পড়ি। পাপ পাপ পূর্ব জন্মের পাপ সব!"

উঠে এলেন এবং দরজার ফাঁকে যে ছোট ইঁটের টুকরোটি গুঁজে

রেখেছিলেন সেটি খুলে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কপাট খুলে গেল। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলাটি আর ছেলেগুলি উঠে পড়ল গাড়িতে।

ভদ্রলোক এদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করলেন তা আমার আর দেখবার অবসর হল না। কারণ সঙ্গে সঙ্গে আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"মনিহারী যাচ্ছিস বুঝি—"

"হ্যাঁ—"

"আমার গাড়িতে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে একটু। কেস যোগাড় করেছি তোর জন্যে দুটো—" আমি ইন্‌সিওরেন্সে দালালী করি তখন। কেসের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

"জায়গা আছে তোর গাড়িতে ?"

"আছে।"

সেই কুলিটাকে দিয়েই জিনিসপত্র বইয়ে আবার অন্য একটা কামরায় হাজির হলাম গিয়ে।

সকরিগলি ঘাটে গিয়ে আর দাড়িওলা ভদ্রলোকের খোঁজ পাই নি। প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে কে যে কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই।

স্টীমারে উঠে তাঁকে দেখতে পেলাম। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখলাম তিনি গঙ্গায় স্নান করছেন, আর ওই তিনটি ছেলেকে স্নান করাচ্ছেন। সকরিগলিতে স্টীমার খানিকক্ষণ থামে, স্নান করে নেওয়ার সময় পাওয়া যায়। দেখলাম দাড়িওলা ভদ্রলোক খুব স্নেহভরে স্নান করাচ্ছেন ছেলেগুলিকে। গামছা দিয়ে ঘসে ঘসে গায়ের ময়লা তুলছেন, মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, চোখের কোণ পরিষ্কার

করে দিচ্ছেন। ছেলেগুলো আপত্তি করছে, কিন্তু তিনি শুনবেন না। দেখে বেশ অবাক লাগল। এই লোকই কিছুক্ষণ আগে ওদের ট্রেনে উঠতে দিচ্ছিল না!

…স্টীমারে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ওই ভদ্রলোক কি আপনার কোনো আত্মীয় হন?"

"না। এই একটু আগেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হল ঘাট-ট্রেনে। উনি হিন্দু আমি মুসলমান। একথা অবশ্য বলি নি ওঁকে। ভদ্র-লোকের মাথায় একটু ছিট আছে—"

এই বলে মুচকি হাসলেন।

"ও"

আর কিছু বললাম না।

ওপারে গিয়ে মনিহারীর ট্রেনে চড়বার সময় দেখলাম দাড়িওলা ভদ্রলোক সেই ছোট ছেলেটিকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে আদর করছেন আর সে মুঠো করে তার দাড়ি চেপে ধরেছে।

"আরে দেবেনবাবু যে কোথা চলেছেন—"

"দিনাজপুর যাব"

দেখলাম মনিহারী ঘাটের একজন টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে দাড়িওলা ভদ্রলোকের কথা হচ্ছে। টিকিট কালেক্টারটি আমারও চেনা। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাড়ি যাচ্ছেন না কি—"

"হ্যাঁ—"

আমি একটি কামরায় গিয়ে উঠে বসলাম। একটু পরে সেই টিকিট কালেক্টার ভদ্রলোকও এলেন আমার কামরায়। একথা-

সেকথার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি ওই দাড়িওলা ভদ্রলোককে চেনেন না কি!"

"হ্যাঁ খুব চিনি। পূর্ববঙ্গে আমাদেরই গ্রামে বাড়ি ওর। খুব নামী পরিবারের ছেলে—"

তারপর একটু থেমে বললেন, "গত রায়টে ওঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

"কি রকম—"

"ঘর-বাড়ি তো সব গেছেই, পুড়িয়ে দিয়েছে সব। ওঁর স্ত্রী ছেলে মেয়েগুলোকে পর্যন্ত মেরে ফেলেছে। কেউ নেই—"

নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম।

বিনোদ ডাক্তার

বরাবরই ধারণা ছিল বিনোদ ডাক্তার খুব উঁচুদরের লোক। চিকিৎসক হিসাবে এ অঞ্চলে ওর জোড়া নেই, তাছাড়া লোক চমৎকার। গরীবের মা-বাপ। বর্ধমানের কাছে এক পাড়াগাঁয়ে ওর বাড়ি। বছর চারেক আগে এখানে এসেছিল প্র্যাকটিস করতে, এসেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে। শহরের মাঝখানে জমি কিনে বাড়ি করতে শুরু করছে। রূপে গুণে সমান। বেশ সুপুরুষ চেহারা। ইয়া লম্বা, ইয়া বুকের ছাতি। মাথার সামনের দিকটা সামান্য একটু টাক আছে অবশ্য, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি, বরং গাম্ভীর্য যেন বেড়েছে একটু। আমি যখনই খবর পেলাম যে বিনোদ আমাদের পালটি ঘর তখন থেকেই ওর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ল। বোনটির এখনও বিয়ে দিতে পারি নি। লোকের কাছে বলে বেড়াই বটে কুড়ি, কিন্তু ওর আসল বয়স পঁচিশ। আর বেশী দেরি করলে, চুলে হয়তো পাক ধরে যাবে। কিন্তু বিয়ের বাজারের যা অবস্থা। তার ওপর বোনটি আমার একটু কালো। চোখ মুখের ছাঁদ খারাপ নয়, লেখাপড়াও শিখিয়েছি কিন্তু এ পোড়া-দেশে রূপ আর রূপিয়ার যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে মেয়ের বিয়ে হয় না। এক জায়গায় প্রায় লেগে গিয়েছিল, কিন্তু কুষ্ঠি বাদ সাধল। ভৌম-দোষ বেরিয়ে গেল। কিন্তু বিনোদ ডাক্তারকে

দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হল। শুনলাম বিয়ে হয় নি, মা-বাবা নেই, কোনও বখেড়াবাজ অভিভাবক নেই। কৌশলে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বিনোদের বয়স পঁয়ত্রিশ। বেশ মানাবে।

সুতরাং লক্ষ্য স্থির রেখে আধুনিক যুগের কায়দা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিলাম। মেয়েদের সময়ে বিয়ে না দিলে নানা রকম ব্যাধি জোটে শরীরে। বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, ফিট। আমার বোন অমিতারও লেগে থাকত একটা না একটা। আমি এতদিন হোমিওপ্যাথী ওষুধই দিতাম, নিজেরই বাক্স ছিল একটা। কিন্তু একদিন মনে হল এই সূত্রে বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে অমিতার যদি পরিচয়টা করিয়ে দিতে পারি, আর বিনোদ যদি টোপটা গিলে ফেলে তাহলে আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

বুক ধড়ফড় করছিল একদিন অমিতার। বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে আনলুম। অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলে সে। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলে। ফি দিতে গেলুম, বললে, "আগে ভালো হোক তারপর ফি নেব।" শুনলাম মধ্যবিত্ত বা গরীব বাঙ্গালীদের কাছ থেকে সে ফি নেয় না। ওষুধে ফল হল খুব। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালাম একদিন। তারপর থেকে প্রায়ই আসত যেত। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। আমার সঙ্গে তো বটেই, অমিতার সঙ্গেও। তারপর একদিন কপাল ঠুকে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেললুম। শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মনে হল মুখটা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। তারপর হেসে বলল, "না, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন!"

"বাধা আছে।"

বলেই এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে আমি আর বলতে সাহস করলাম না যে বাধাটা অতিক্রম্য কি না। এরপর থেকে সে আমাদের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দিল। ভারি বেকুব হয়ে গেলাম। কি করতে কি হয়ে গেল।

তারপর সসঙ্কোচে গেলাম তার বাড়িতে একদিন। উদ্দেশ্য পুনরায় তাকে নিমন্ত্রণ করে ভাব-সাব করা। গিয়ে দেখি একটি অচেনা লোক বসে আছে আর তার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হচ্ছে।

"আপনাকে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু"

"কোলকাতায় কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, সেখানে আমার যাবার তো কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু তিনি আপনাকে ছাড়া আর কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। জ্বরও হয় রোজ। কিন্তু তিনি অন্য কোনো ডাক্তারকে কাছে ঘেঁসতে দেবেন না।"

"এর মানে কি—"

"সে আপনি গেলে হয়তো বুঝতে পারবেন। আমি তো জানি না। আমি চাকর মাত্র—"

"আচ্ছা ঠিকানাটা রেখে যান। আজ না পারি কাল যাব।" ভদ্রলোক ঠিকানাটা লিখে দিলেন একখানা কাগজে। আমিও দেখলাম ঠিকানাটা।

দিন সাতেক বিনোদ ডাক্তার আর ফিরলই না।

যখন ফিরল তখন একটি মেয়ে সঙ্গে করে!

শুধু তাই নয় মেয়েটির সঙ্গে বাস করতে লাগল!

তাজ্জব বনে গেলাম আমি! গেল রুগী দেখতে ফিরল একটা মেয়ে সঙ্গে করে। তারপর শুনলুম মেয়েটাকে নিয়ে ধরমপুর স্যানাটরিয়মে যাচ্ছে। কোথা থেকে ভাগিয়ে নিয়ে এল এই ঘাটের মড়াটাকে? কিন্তু সামনাসামনি একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। দিন কয়েক পরে নিজেরই একটা কাজে কোলকাতা যেতে হয়েছিল। সেই ঠিকানাটা মনে হল। গেলাম সেখানে। দেখলাম প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটে দারোয়ান রয়েছে। ভেতরে খবর পাঠালাম যে বিশেষ প্রয়োজনে একবার দেখা করতে চাই। দারোয়ান আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। দেখলাম দিব্যকান্তি একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। ধপধপে ফরসা রং, চোখ দুটি টকটকে লাল।

"কি চান—"

"আমি বিনোদ ডাক্তারের খবর নিতে এসেছি"

"কি খবর—"

"আমার বোনের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম কিন্তু—"

"কিন্তু তিনি বিয়ে করেন নি, এই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"করলে আমি হাতে স্বর্গ পেতাম।"

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।" আমি বসতেই ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে একটা চাকর কিছু খাবার আর চা দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের দেখা আর পেলাম না। কিন্তু আসল খবরটা যোগাড় করতে বিলম্ব হল না আমার। চা জলখাবার খেয়ে পাড়াতেই আশেপাশে খোঁজ করলাম। যা শুনলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। বিনোদ ডাক্তার বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীকে এই ধনীর দুলালটি সম্মোহিত করে ভাগিয়ে এনেছিলেন। দিনকতক পর স্ত্রীটির

হল যক্ষ্মা। এত বড় পাপের ফল ফলবে না? এই খবর পেয়ে বিনোদ ডাক্তার এল। এসে নিয়ে গেছে—।

তারপর কি হয়েছে পাড়ার লোকেরা জানে না।

ফেরবার সময় একখানা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। তাতে চোখে পড়ল একজন লোক তার বিশ্বাসঘাতিনী অসতী স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কতরকম মানুষই যে আছে এই পৃথিবীতে!

স্মৃতির খেলা

সব শক্তির মতই স্মৃতি-শক্তি ব্যাপারটাও একটু গোলমেলে। কখন যে কি খেলা খেলেন বলা শক্ত। কখনও কৃপা করেন, কখনও করেন না। সেদিন আমার ভাগ্যে দুরকমই হল এবং দুবারই নাকাল হতে হল আমাকে।

...ফার্স্ট ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করে যাচ্ছি। গাড়িতে উঠে দেখলাম আর কোনও যাত্রী নেই। নটা বেজে গেছে, সুতরাং গাড়িটি ভিতর থেকে 'লক্' করে শুয়ে পড়ার কোনো বাধা ছিল না। প্যাণ্টটি খুলে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর লুঙ্গিটি পরে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু 'লক্' করতে ভুলে গেলাম। ফল যা হল তা মর্মান্তিক। গভীর রাত্রে দড়াম্ করে একটা শব্দ হল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আলো জ্বেলে দেখি সামনের বেঞ্চে আড়ময়লা কামিজ-পরা এক ভদ্রলোক অপ্রস্তুত মুখে বসে রয়েছেন আর গাড়ির মেজেতে একটা হাঁড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে। তার থেকে কালো চটচটে একটা পদার্থ কামরার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে।

"কে আপনি মশাই, এ কি কাণ্ড!"

হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক বললেন, "আলকাতরার হাঁড়িটা ওই টেবিলটার উপর রেখেছিলাম, কিন্তু ট্রেনটা এমন ঘচাং করে থামল যে হাঁড়িটা পড়ে গেল—"

আলকাতরা! ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আমার ঝোলানো-প্যাণ্টের পা দুটোতে লেগেছে, বেঞ্চির নীচে স্যুটকেসটা ছিল তাতে লেগেছে আর জুতো-জোড়া-তো মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গার্ডকে ডাকলাম। দেখলাম ট্রেন একটা বড় স্টেশনেই দাঁড়িয়েছে।

গার্ডসাহেব এসে সব দেখে শুনে বললেন, "আচ্ছা, আমি একটা মেথর পাঠিয়ে দিচ্ছি, যতটা পারে পরিষ্কার করে দিক—"

গার্ডসাহেব চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কালেকটার এলেন। দেখা গেল ভদ্রলোকের টিকিট থার্ডক্লাসের।

টিকিট কালেকটার তাঁকে জিগ্যেস করলেন—"কোথা যাবেন আপনি"

"এখানেই নামব"

টিকিট কালেকটার তখন পকেট থেকে ছোট বই বার করলেন একটি। বইটি দেখে বললেন, "আপনাকে দশটাকা সাড়ে পনর আনা এক্সেস্ ফেয়ার দিতে হবে"

"আমার কাছে তো একটি পয়সা নেই। আমি অন্ধকারে বুঝতে পারি নি এটা কোন ক্লাস। আমাদের স্টেশনে ট্রেনও এক মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। সামনে যে গাড়ি পেয়েছি তাতেই উঠে পড়েছি"

টিকিট কালেকটার বললেন, "ওসব কথা জেনে আমার লাভ নেই। এক্সেস্ ফেয়ার আপনাকে দিতেই হবে। আপনি শুধু যে বিনা টিকিটে এসেছেন তা নয়, রাতদুপুরে একজন ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জারকে বিব্রত করে তাঁর গুরুতর ক্ষতি করেছেন। আসুন আমার সঙ্গে"

টিকিট কালেকটারের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক চলে গেলেন। দেখা গেল, আলকাতরার হাঁড়িটি ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিল না।

তারপর মেথর এল জল আর ঝাড়ু নিয়ে।

সে সব দেখে শুনে একটি সদুপদেশ দিলে আমাকে।

"পাশের কামরাটাও একদম খালি আছে বাবু। আপনি সেখানেই চলে যান। এ আলকাতরা সাফ করা এখন মুশকিল। কেরোসিন তেল না হলে উঠবে না। আমি আপনার জিনিসপত্রগুলো একটু মুছে-টুছে দিচ্ছি"

"ট্রেন কতক্ষণ থামবে এখানে ?"

"বহুতক্ষণ থামবে হুজুর। অনেক মাল আছে। তাছাড়া আর একটা ট্রেনের সঙ্গে ক্রশিং হবে এখানে। আধঘণ্টা দাঁড়াবে এখানে। ইন্‌জিনও বদলি হবে"

মেথরটাই একটা কুলি ডেকে এনে পাশের কামরায় সব ব্যবস্থা করে দিলে আমার। বকশিশ দিলাম তাকে।

পাশের কামরায় যখন গুছিয়ে গিয়ে বসলাম তখন আমার স্মরণ-শক্তি দ্বিতীয় খেলাটি খেললেন।

অনেক দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

তখন আমি কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। হাওড়া স্টেশনে থার্ডক্লাস কামরায় বসে আছি। যদিও সেদিন ভিড় খুব, তবু ভাল জায়গাই পেয়েছিলাম ভাগ্যক্রমে। জানলার ধারে বসেছিলাম মুখ বাড়িয়ে।

"কিরে ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিস নাকি—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম প্রশ্নকর্তা সাহেবি-পোশাক-পরা মুখে-পাইপ

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলাম। বাবার বন্ধু একজন। রেলের বড় অফিসার। প্রশ্ন করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

"থার্ডক্লাসের টিকিট বুঝি তোর। খুব ভিড় আজকে। ওহে রায়, শোন—"

একটি টিকিট কালেকটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"এই ট্রেনে তুমিই কি সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যাচ্ছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এ আমার বাল্যবন্ধুর ছেলে। ভিড়ে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে নিয়ে যাও"

"যে আজ্ঞে। আসুন আপনি"

আমি থার্ডক্লাস থেকে নেমে পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করলাম, তারপর রায়মশায়ের অনুসরণ করে একটি ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে চড়লাম।

একেবারে ফাঁকা গাড়ি

বাবার বন্ধু আবার এলেন আমার কাছে।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যা। রায় তোকে সাহেবগঞ্জে উঠিয়ে দেবে"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে আছি। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, প্রথম ঘণ্টা হয়ে গেছে এমন সময় ছুটতে ছুটতে কানুদা এসে হাজির। হাতে একটা হাঁড়ি।

"ও, তুই যাচ্ছিস এই ট্রেনে, যাক বাঁচলাম। এই গুড়ের নাগরীটা মামাকে দিয়ে দিস তুই। খেতু আজ যাবে বলেছিল, তার হাত দিয়েই এটা পাঠাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দেখছি আসে নি, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আজকালকার ছোকরারা।"

কানুদা কামরায় উঠে গুড়ের নাগরীটি বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন।

"কোণের দিকে ঠেসিয়ে রেখে দিলাম, খুব সাবধানে নিয়ে যাস—"

গার্ডের হুইসল বাজল, কানুদা লাফিয়ে নেবে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে এবং খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল গভীর রাত্রে, এক মেমসাহেবের চিৎকারে। উঠে দেখি একটি স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার কামরার সামনে ভিড় জমে গেছে একটা। জিগ্যেস করলাম ব্যাপার কি। শুনলাম মেমসাহেব নাকি আমার কামরায় ঢোকবার জন্য দরজা খুলে একটি পা ঢুকিয়েছিলেন, কিন্তু সে পা-টি আর তুলতে পারেন নি। তাঁর জুতো কামরার মেজেতে একেবারে সেঁটে গিয়েছিল। তিনি পা-টি কোনরকমে বার করে নিয়েছেন, কিন্তু জুতোটি উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর চিৎকারে চেঁচামেচিতে স্টেশন মাস্টার, গার্ড, টিকিট কালেকটার সবাই এসে জুটে গেছেন। গাড়ির আলো জ্বেলে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কানুদার সেই গুড়ের নাগরী কামরাময় গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়িয়েছে আর সমস্ত মেজেটা চটচটে গুড়ে ভরতি হয়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টার জিগ্যেস করলেন, "এ নাগরী কি আপনার?"

"না। আমি কিছু জানি না।"

স্টেশন মাস্টার তখন নিজেই হেঁট হয়ে মেমসাহেবের জুতোটিকে গুড়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। তারপর গদগদ বিনীত কণ্ঠে মেমসাহেবকে বললেন, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি, ম্যাডাম। এ

গাড়িতে আপনার বসা চলবে না, পিছনের দিকে আর একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরা আছে, সেইখানে চলুন”

সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে স্টেশন মাস্টার, গার্ড সবাই চলে গেলেন।

তখন সেই টিকিট কালেকটারটি আমার কাছে দাঁড়ালেন এসে।

তাঁকে আমি নিম্নকণ্ঠে জিগ্যেস করলাম, “আমি কি নেবে যাব?”

“না, না, নাববেন কেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন। ওরাই কি টিকিট কিনে যাচ্ছে নাকি। ওরা প্ল্যানটার সায়েব, প্রায়ই যাতায়াত করে। এক নাগড়ী গুড় নষ্ট হল, এইটেই যা দুঃখের। আপনার সঙ্গে যে গুড় ছিল তা তো জানতাম না—”

বললাম তাঁকে সব কথা।

“ও। তাই বুঝি। আচ্ছা আমি মেথর ডেকে গাড়িটাকে ধুইয়ে দিচ্ছি। তা না হলে আপনার অসুবিধে হবে—”

মেথর এসে কামরাটি পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। আমি নির্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম।

উক্ত গল্পটি মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হতে লাগল সেই সহৃদয় টিকিট কালেকটারটি না থাকলে এ ভদ্রলোকের আজ যে দুর্দশা হয়েছে আমারও সেই দশা হত। না হয় ভদ্রলোক ভুল করে ফার্স্ট ক্লাসে চড়েই পড়েছেন, তা বলে হাজতে যেতে হবে তাঁকে! তাঁর অসহায় মুখচ্ছবিটা চোখের উপর ভাসতে লাগল। খচখচ করতে লাগল মনটা। পকেটে সদ্য-প্রাপ্ত ফি দুশ টাকা ছিল। ভাবলাম আমিই না হয় দিয়ে দি ভদ্রলোকের ভাড়াটা। কতদিকে কতই তো বাজে খরচ হয়—আমার স্মৃতিশক্তি অতীতের সেই

ঘটনাটিকে বেশ উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন আমার মানসপটে।

নেবে পড়লাম।

স্টেশন মাস্টারের কামরার কাছে এসে শুনতে পেলাম সেই টিকিট কালেকটার ভদ্রলোক তারস্বরে বলছেন, "মাপ করবেন মশাই, আমি ছাড়তে পারব না। চাকরি করি, চাকরির আইন মেনে আমাকে চলতেই হবে। হয় ভাড়া দিয়ে দিন, না হয় লক্‌-আপে থাকুন"

"শুনুন—"

হাতছানি দিয়ে ডাকলাম আমি ভদ্রলোককে।

"কি বলছেন"

"ছেড়ে দিন ভদ্রলোককে"

"মাপ করবেন. তা আমি পারব না"

"আমি ওঁর ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছি"

"আপনি দেবেন কেন, ওরকম লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়"

এমন সময় স্টেশন মাস্টার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"আবার কি হল। ঝামেলা মিটিয়ে ফেল না বাপু তাড়াতাড়ি"

"এই ভদ্রলোক ওঁর হয়ে ভাড়াটা দিয়ে দিতে চাইছেন"

"কে—"

আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়েই কিন্তু স্টেশন মাস্টারের মুখের চেহারা বদলে গেল। তাঁর স্মরণ-শক্তি কৃপা করলেন তাঁকে। উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এসে তিনি আমার পায়ের ধুলো নিলেন।

"ডাক্তারবাবু যে, আপনি কোথা থেকে—"

"একটা রোগী দেখে ফিরছি। এই লোকটিকে ছেড়ে দিন, এঁর ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

"আরে, ভাড়া দিতে যাবেন কেন। আপনি ছেড়ে দিতে বলছেন, তাই যথেষ্ট—"

মাস্টার মশাই যখন আমাদের স্টেশনে ছিলেন তখন তাঁর ছেলের টাইফয়েডের চিকিৎসা করেছিলাম আমি।

"শনটু কেমন আছে আজকাল—"

"ইয়া মোটা হয়েছে। এখন দেখলে চিনতেই পারবেন না"

ক্লিওপেট্রা

শ্রীসুরেশ মল্লিকের ভাড়াটে বাড়ির অভ্যন্তর। সাধারণভাবে সজ্জিত। সুরেশ মল্লিক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বয়স ত্রিশ। পরিধানে আড়-ময়লা সাহেবি পোশাক। মুখের ভাব ক্লান্ত। হাতে যে চৌকো চামড়ার ব্যাগটি ছিল সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া এদিক-ওদিক চাহিলেন। কাছে-পিঠে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাক দিলেন।

সুরেশ। বীণু, বীণু, বীণা। [অর্ধস্বগত] আজও আবার কোথাও বেরিয়েছে না কি ?

[ভৃত্য হারাধন প্রবেশ করিল]

হারাধন। মা বাইরে গেছেন। চাবিটা রেখে গেছেন। জলখাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

সুরেশ। কোথা গেছেন ?

হারাধন। সিনেমা বোধহয়। ঠিক জানি না। কনকবাবু দুপুরে এসেছিলেন।

সুরেশ। ও !

[কোটটা খুলিয়া আলনায় রাখিলেন]

হারাধন। চায়ের জল চড়াব ?

সুরেশ। চড়িয়ে দে। বীণু কিছু বলে যায় নি তোকে ?

হারাধন। আলুর দম করতে বলে গেছেন। আলু কিন্তু নেই।

সুরেশ। সে কথা তাকে বলতে পার নি ?

হারাধন। বলেছিলুম। তিনি বললেন, আমার কাছে পয়সা নেই বাবুর কাছে চেয়ে নিও।

[সুরেশ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলেন। হারাধন চটি জুতো আগাইয়া দিল]

সুরেশ। আলুর জন্যে ক-পয়সা দিতে হবে ?

হারাধন। চার আনা।

সুরেশ। আর কিছু আনতে হবে ?

হারাধন। না।

[সুরেশ মানিব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিলেন]

সুরেশ। আমার খাবারটা ঠিক করে দিয়ে তারপর বাজার যা।

হারাধন। খাবার কি এখানেই আনব ?

[সুরেশের মেজাজ ক্রমশই খারাপের দিকে যাইতেছিল, তিনি অকারণে ধমকাইয়া উঠিলেন]

সুরেশ। এখানে কি আমি খাই !

[হারাধন চলিয়া গেল। বাহিরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হইল। সুরেশ গিয়া কপাট খুলিয়া দিলেন। ফতুয়া-পরা একটি লোক প্রবেশ করিল]

লোকটি। মুদির দোকানের বিল এনেছি বাবু। মা এই সময় আসতে বলেছিলেন।

সুরেশ। তিনি এখন বাড়ি নেই।

লোকটি। কখন আসব তাহলে ?

সুরেশ। কাল সকালে এস।

[নমস্কার করিয়া লোকটি চলিয়া গেল। সুরেশ কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং যদিও ঘরে কেহ ছিল না তবু কথা বলিতে লাগিলেন।]

আশ্চর্য মেয়ে দেখছি বীণু। রোজই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। রেডিও কিনতে চাইলে, ধার-ধোর করে তা-ও কিনে দিলাম। তবু বাড়িতে মন বসছে না। টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে ভালোও লাগে। আশ্চর্য !

[ঘরেব এক কোণে রেডিওটা ছিল, সেটার দিকে সুরেশ ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কি মনে করিয়া সেটা খুলিয়া দিলেন। সরোদে একটা চটুল গৎ বাজিতে লাগিল। সঙ্গীতের আবহাওয়ায় কামিজটা খুলিয়া তিনি পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরেই ফিরিলেন, তখন আর পরনে প্যাণ্ট নাই, লুঙ্গি। দুয়ারে আবার কড়া নড়িল। কপাট খুলিয়া দিতেই প্রবেশ করিল কনক, সুরেশের সমবয়সী এবং বন্ধু। সুশ্রী চেহারা। মাথার চুল উসকো-খুসকো]

সুরেশ। সিনেমা শেষ হল ? বীণা কই ?

কনক। সিনেমা যাই নি। রেস খেলতে গিয়েছিলাম। হেরে ভূত হয়ে গেছি। কিছু ধার দিতে পারিস। একেবারে পেনিলেস আজ—

সুরেশ। আমারও ওই অবস্থা, আমার যা কিছু জমানো টাকা

ছিল তা বীণুর দুল কিনতে আর ওই রেডিও কিনতে শেষ হয়ে গেছে। রেডিওর সব দামটাও দিতে পারি নি এখনও। তোমার তবু চাকরি আছে, আমার তাও নেই। কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পাচ্ছি না। তুমি পাঁচ শ' টাকা মাইনে পাও তবু তোমার একার কুলোচ্ছে না!

কনক। কুলোচ্ছে কই। খরচ যে অনেক। তোমার বীণাই তো আমাকে আরও ফতুর করলে। আজ থিয়েটার, কাল সিনেমা, পরশু হোটেল—লেগেই আছে একটা না একটা। তুমি ওকে সামলে রাখ ভাই, আমি আর পেরে উঠছি না।

সুরেশ। কুকুর হলে বেঁধে রাখতাম। কিন্তু ও মানুষ, শুধু মানুষ নয়, বিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্তা নারী। ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার শক্তি আমার নেই। এদিকে আমার গৃহস্থালীও অচল হয়ে উঠেছে—কিন্তু কি করি বল?

কনক। তুমি ওকে বিয়ে করতে চাইছ কেন বল তো। ও রকম বোহিমিয়ান মেয়েকে নিয়ে সংসার করা চলে না, হৈ-হৈ করা চলে।

সুরেশ। ভালোবাসি যে—

কনক। [মৃদু হাসিয়া] ও, বিয়ে না করলে বুঝি ভালোবাসা যায় না?

সুরেশ। [অধীরভাবে] দেখ, ও সব তর্ক অনেক হয়েছে। আমি ওকে বিয়েই করব ঠিক করেছি। [সহসা রুক্ষকণ্ঠে] তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন!

কনক। বাড়িতে এসে হাজির হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেব? দেওয়া যায় কখনও, বিশেষতঃ বীণুর মতো মেয়েকে? আমিও তো ওর সহপাঠি। তাছাড়া [হাসিয়া] প্রথমে আমিই ওর

প্রেমে পড়েছিলাম। আমি যদি ওকে প্রশ্রয় দিতুম তুমি কলকে পেতে না।

[ইহাতে সুরেশের আত্মসম্মান বেশ ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু তাঁহার আহত আত্মসম্মান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত যদি তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না।]

সুরেশ। 'যদি ওকে প্রশ্রর দিতুম' একথা বলছ কেন। প্রশ্রয় তখনও দিয়েছিলে, এখনও দিচ্ছ। আমি যদি ওকে ভাল করে না চিনতাম অন্য রকম সন্দেহ হত। কিন্তু ওকে আমি ভাল করে চিনি, কিন্তু আই মাস্ট সে—

[হঠাৎ থামিয়া গেলেন]

কনক। চটেছ মনে হচ্ছে। চললাম তাহলে। বীণুকে বলে দিও যে-রঙের শিফনের শাড়ি সে চেয়েছিল সে রং পাই নি। আচ্ছা, চললুম।

[কনক চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশী রমণীমোহনবাবু প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোক প্রৌঢ়, কিন্তু তবু বেশ ছিমছাম, কবি-কবি ভাব]

সুরেশ। [ভদ্রতা সহকারে] আসুন রমণীবাবু, কি মনে করে?

রমণী। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী কি ফিরেছেন?

[কথাগুলি ওজন করিয়া খুব মোলায়েম-ভাবে বলিলেন]

সুরেশ। না, কোনও দরকার আছে কি?

রমণী। তিনি আমার সাইকেলটা নিয়ে গেছেন কিনা। আমাকে এখন একবার বেরুতে হবে।

সুরেশ। আপনার সাইকেল নিয়ে গেছে না কি! কি অন্যায়! এখনও ফেরে নি তো। সত্যি কি অন্যায়।

রমণী। তাতে কি হয়েছে, আমি না হয় অপেক্ষা করব। দুপুরে তো প্রায়ই নিয়ে যান উনি আমার সাইকেল।

সুরেশ। [বিস্মিত] তাই না কি?

রমণী। তাতে কি হয়েছে, তাতে কি হয়েছে?

[বীণুর প্রবেশ। সঙ্গে একটি আট-দশ বছরের ছেলে। হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-শার্ট পরা। সুশ্রী সজীব চেহারা। তাহার হাতে একটি ব্যাট রহিয়াছে। বীণু তন্বী রূপসী। বব করা চুল। রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু সে যে মোহিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হইতে হয়]

বীণু। [রমণীবাবুকে] ও আপনি এখানে। আমি আপনার সাইকেল নিচের ঘরে রেখে এলাম। আপনার অসুবিধে হয়েছে বোধহয়। মাপ চাইছি—দেরি হয়ে গেছে সত্যি। রাগ করেছেন তো?

[রমণীমোহন ভদ্রতার আতিশয্যে গলিয়া পড়িলেন]

রমণী। না, না, কিছুমাত্র নয়। আমাকে এখুনি একবার একটু বেরুতে হবে তাই খোঁজ করতে এসেছিলাম আপনি ফিরেছেন কি না। যদি দরকার হয় আবার নিতে পারেন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব। ছেলেটার জন্য ওষুধ আনতে হবে।

বীণু। ও, আপনার ছেলের অসুখ না কি। তা তো জানতুম না। চলুন দেখে আসি। [যাইতে উদ্যত]

রমণী। [কৃতার্থ] যাবেন ? আচ্ছা, আমি ফিরে আসি তারপর যাবেন। এখুনি ফিরব।

[রমণীমোহন চলিয়া গেলেন। সুরেশ নিষ্পলক দৃষ্টিতে বীণুর দিকে চাহিয়া ছিলেন। বীণু সেদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল। তাহার পর কথা বলিল।]

বীণু। [ছেলেটিকে দেখাইয়া] আমার নতুন বন্ধুটিকে দেখ।

সুরেশ। ও, নাম কি ?

বীণু। তোমার নাম কি বল। ইনিও আমার একজন বন্ধু।

[ছেলেটি নমস্কার করিল]

ছেলেটি। আমার নাম শ্রীইন্দ্রজিৎ বসু।

বীণু। রাস্তায় একটা রিক্সার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাকে ঘিরে হৈ-হৈ করতে লাগল, কেবল এ-ই দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে টিংচার আইয়োডিন, ছেঁড়া ন্যাকড়া, তুলো নিয়ে এসে পা-টা বেঁধে দিলে। ছড়ে গেছে খানিকটা।

[শাড়ি একটু তুলিয়া পা দেখাইল]

সুরেশ। তাই না কি। বেশী লাগে নি তো, হাড়-টার—?

বীণু। কিচ্ছু না, লাভই হয়েছে বরং। অ্যাকসিডেণ্ট না হলে এমন বন্ধুটি কি পেতুম ? ওকে একটা ব্যাট কিনে দিয়েছি। ইন্দ্রজিৎ কিছু খাবে না কি ?

ইন্দ্রজিৎ। না, আমার পেট ভরা আছে। আর একদিন আসব। দেরি হলে মা ভাববে। চললুম এখন।

[এক ছুটে বাহির হইয়া গেল]

বীণু। চমৎকার ছেলেটি, না ?

সুরেশ। ছেলেটি তো চমৎকার। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বল তো। একদিনও বাড়ি ফিরে দেখলাম না যে তুমি বাড়িতে আছ।

বীণু। [বিস্মিত] তোমার অপেক্ষায় দিন-রাত ঘরে বসে থাকব। তাই তুমি প্রত্যাশা কর না কি। যা কখনও করি নি তা করব কি করে ?

সুরেশ। যদি গৃহস্থালী পাততে চাও—

বীণু। তাহলে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হবে ?

সুরেশ। কনকের ওখানে বড্ড বেশী যাতায়াত করছ।

বীণু। কনকের কাছেও যাব না। [সহসা] আচ্ছা, তুমি কি হয়ে যাচ্ছ বল তো—! আমি কি একটা নির্জীব আসবাব যে দিন-রাত ঘরের কোণে পড়ে থাকব ?

সুরেশ। সাধারণ আসবাব নও। বহুমূল্য রত্ন। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকলে টপ করে তুলে নেবে কেউ।

বীণু। ইস নিলেই হল। দু-একজন চেষ্টা করেছে অবশ্য। ও, হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলেছি। ক্লিওপেট্রার ওপর তুমি যে থীসিসটা লিখেছ সেটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন প্রফেসার মজুমদার। সত্যি খুব ভাল হয়েছে ওটা [একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সহসা] একটা কথা তোমাকে বলব ? তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব। কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে লজ্জা করছে। সরে এস কানে কানে বলি।

[সুরেশের কানে কানে গিয়া বলিতেই সুরেশ চমকাইয়া পিছাইয়া গেলেন। মনে হইল তাঁহাকে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল]

সুরেশ। আমি সংযম করে আছি, আলাদা ঘরে শুই—আর তুমি বলছ—

বীণু। কি জানি কোথা দিয়ে কি করে কি হয়ে গেল।

সুরেশ। আর সে কথা তুমি আমাকে বলছ!

বীণু। তোমাকে বলব না তো কাকে বলব। তোমাকে যে আমি ভালবাসি। আমার সমস্ত বিপদ আপদ দোষ ত্রুটি তোমাকেই তো সামলাতে হবে। আর আমি জানি তুমি তা পারবে। ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধে অমন দরদ দিয়ে যে থীসিস লিখতে পারে সে—

[দুয়ারের কড়া নড়িল। দ্বার খুলিতেই পিওন চিঠি দিয়া গেল]

সুরেশ। [চিঠিটা পড়িয়া] যাক এ চাকরিটাও হল না।

বীণু। তুমি কোথায় দরখাস্ত করেছিলে?

[সুরেশের চিঠিটা লইয়া দেখিল]

আরে, আমিও যে এখানে দরখাস্ত করেছিলাম। আমি সিলেকটেড হয়েছি। আমার ইণ্টারভিউ ছিল আজ। সেখানেই তো গিয়েছিলাম। [লীলাভরে মাথা নাড়িয়া] আমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল মশাই, তোমার সেকেণ্ড ক্লাস—।

[সুরেশ বিবর্ণ মুখে চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িলেন। বীণু সোজা গিয়া তাহার কোলের উপর বসিল এবং গলা জড়াইয়া ধরিল]

ও কি, আমার দিকে চাও। অমন করছ কেন। সমস্যা তো মিটেই গেল, তুমিই চাকরি পাও বা আমিই চাকরি পাই, একই কথা। কালই চল বিয়েটা সেরে ফেলা যাক।

সুরেশ। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের কি রাজ-যোটক হবে ?

বীণু। কিন্তু তুমি যে ডক্টরেট পাবে শুনে এলাম। আমি বই মুখস্থ করে ফার্স্ট ক্লাস হতে পারি। কিন্তু ক্লিওপেট্রার ওপর অমন থীসিস লিখতে পারি কি ? [সহসা] তুমি আমার অ্যানটনি—

[পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।
তাহার পর সহসা আলিঙ্গনবদ্ধ হইল।]

রসময়ের অভিজ্ঞতা

বৃদ্ধ রসময় রক্ষিত একটু উত্তেজনাভরেই আমার ক্লিনিকে এসে সেদিন বললেন, "মাপ করবেন ডাক্তারবাবু, সেদিন তর্কের মুখে আপনাদের বিজ্ঞানকে বুজরুকি বলে ফেলেছিলাম। আজ আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমি আমার কথা প্রত্যাহার করতে এসেছি। আর একটা কথাও আপনাকে জানাতে এসেছি যা আপনিও হয়তো জানেন না, কিংবা হয়তো জানেন, কারণ আপনারা ডাক্তাররা সর্বজ্ঞ।"

"বসুন, কি কথা"

"উঃ, খুব বেঁচে গেছি ডাক্তারবাবু। আর একটু হলে গিন্নির নোয়া সিঁদুর ঘুচে গিয়েছিল আর কি—"

রক্ষিত মশায় খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন নিজেকে।

"আপনি হাজারিবাগ গিয়েছিলেন না?"

"হ্যাঁ। সেইখানেই তো ওই কাণ্ড। আমার মেয়েটা মানা করেছিল, বাবা জঙ্গলের ভিতর বেড়াতে যাবেন না, ওখানে বাঘ আছে শুনেছি। কিন্তু আপনারা ঘড়ি ধরে রোজ একঘণ্টা বেড়াতে বলেছেন, আর হাজারিবাগের সিনারিও চমৎকার। হাঁটতে ভালই লাগত বেশ। কিন্তু একদিন ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম ডাক্তারবাবু।"

"আপনি ইনস্যুলিন নিচ্ছেন আজকাল?"

"আপনারা তো বলেই খালাস, কিন্তু অত পয়সা কোথায় আমার! ওই জন্যেই না সেদিন আপনাদের বিজ্ঞানকে একহাত নিলুম, কিন্তু

এবার আমি মশাই অপদস্থ হয়েছি। ইনস্যুলিন, নিই নি বটে, কিন্তু ওই বিজ্ঞানের জোরেই বেঁচে গেছি সেদিন।"

"কি রকম"

"আপনার হুকুম-মতো সন্ধ্যা বেলা বেড়াতে বেরিয়েছি সেদিন। মেয়েটা সেদিনও মানা করলে, বাবা বেশীদূর যেও না সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলাম! রবি ঠাকুরের গানের লাইনটা গুনগুন করতে লাগল মনের ভিতর—ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে। পলাশে আর কৃষ্ণচূড়ায় চারিদিক লালে লাল। সূর্যাস্ত হচ্ছে, আকাশের মেঘে মেঘে আগুন লেগেছে। 'বউ কথা কও' পাখিও একটা ডাকতে লাগল থেকে থেকে। আর ওই পাখিটাই টেনে নিয়ে গেল আমাকে বনের মধ্যে। পাখিটাকে কখনও দেখি নি। ভাবলুম যদি দেখতে পাই। ঢুকে পড়লুম জঙ্গলে। জঙ্গলে ঢুকে আবার মুগ্ধ। সেখানে যে কত রকমের ফুল, কত রকমের গাছ, কত রকমের পাতা, কত রকমের লতা তার ইয়ত্তা নেই। 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল। কখনও মনে হচ্ছে বাঁ দিক থেকে ডাকছে, কখনও ডান দিক থেকে, কখনও বা সামনে থেকে, কখনও আবার পিছন থেকে। আমি এদিক ওদিক চাইতে চাইতে এগিয়ে চলেছি, হুঁশ নেই। অদ্ভুত নির্জনতা চারিদিকে, একটা অদ্ভুত গন্ধও পেতে লাগলাম। কাছেপিঠে বোধ হয় মহুয়া গাছ ছিল। মনে হল নেশা হয়েছে। নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনে হল 'বউ কথা কও' পাখিটা যেন সুরের ইঙ্গিতে স্বপ্নলোকের পথ দেখাচ্ছে আমাকে। ভাবতে লাগলাম পাখিটা দেখতে কি রকম? নীল কি? ওই কি মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড? কতক্ষণ চলেছিলাম মনে নেই,

সন্ধ্যার অন্ধকার যে গাঢ়তর হয়ে আসছিল সেদিকেও খেয়াল ছিল না, হঠাৎ কিন্তু বজ্রপাত হল! চমকে উঠলাম, সামনে দেখি দুটো বাঘ! একটা প্রকাণ্ড বড়, থলথল করছে চর্বি আর একটা রোগা গোছের। সম্ভবত আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি বড় বাঘটা আমার মুখের কাছে মুখ এনে হ্যা হ্যা করে শুঁকছে। ভাবলাম এইবার মস্তকটি কড়মড়িয়ে চর্বন করবে। কিন্তু মশাই করলে না। কি করলে জানেন?"

"কি?"

"সেই রোগা বাঘটার দিকে চেয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, এর নিঃশ্বাসে বেজায় অ্যাসিটোনের গন্ধ ছাড়ছে যে হে। তার মানে রক্তে খুব বেশী চিনি আছে। একে খাব?"

রোগা বাঘটা তখন ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখলে, সে-ও মুখটা শুঁকলে বার কয়েক।

তারপর বললে, "না খাবেন না। আপনার শুগার কত এখন?"

"পাঁচ পারসেণ্ট।"

"না খাবেন না। আমারও খাওয়া চলবে না, আমারও তিন পারসেণ্ট আছে আজ। এতো মানুষ নয়, মোরব্বা দেখছি। চলুন—"

"আমাকে খেলে না মশাই। হেলে-দুলে চলে গেল দুজনেই! তা হলেই দেখুন বিজ্ঞানের কল্যাণেই বেঁচে গেলাম সেদিন। আর একটা কথাও মনে হল। বঙ্গ-বিহার পুনর্মিলনের প্রস্তাবে বেশ ফল হয়েছে, তা না হলে বিহারের বাঘ অমন পরিষ্কার বাংলা বললে কি করে, তার মানে ওরাও বাই-লিঙ্গুয়াল হয়ে গেছে আর কি—"

কি আর বলব! হাসিমুখে রসময় রক্ষিতের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ফাও

"ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন ?"

"হ্যাঁ এলুম।"

"কত নিলেন উনি"

"পাঁচ হাজার। দৈনিক হাজার টাকাই তো কথা হয়েছিল। পাঁচদিন ছিলেন।"

"আমাকে যদি বলতেন কিছু সস্তায় করিয়ে দিতে পারতুম।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ আছে না কি ?"

"আছে।"

"কি সূত্রে—"

"সেটা আর না-ই শুনলেন।"

গদাধরবাবু মুচকি হাসলেন। তা দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ভোম্বল দাসের। পুনরায় প্রশ্ন করলেন গদাধর।

"কেমন হল ? আমি তো ছিলুম না।"

"অবর্ণনীয়।"

"খুব নাচলে গাইলে—?"

"খুব। মাৎ করে দিলে একেবারে।"

"তা তো দেবেই। কখানা গান গাইলে—"

"পাঁচদিনে তা কম করে খান কুড়ি হবে।"

"খুব গেয়েছে। আর নাচ?"

"সকালে, বিকেলে। তার মানে পাঁচ দিনে দশবার। তা কথক, ভারতনাট্যম্, মণিপুরী, জাভা, এমন কি পোয়ে পর্যন্ত। টাকা উশুল করে নিয়েছি আমরা। দশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি করেছি—"

হঠাৎ ভোম্বল দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন।

"বুঝলেন গদাধরবাবু, মন ভরে গেছে, কানায় কানায় ভরে গেছে, উপচে পড়ছে। ধন্য হয়ে গেছি।"

"কোথা রেখেছিলেন ওকে? নিজের বাড়িতে?"

"আরে বাপস সে সামর্থ্য কি আছে আমার? ছিলেন উনি যোগেনবাবুর বাগান বাড়িতে। তবে ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে আমি হামে-হাল মোতায়েন থাকতুম সেখানে! এ রকম সৌভাগ্য কজনের হয় বলুন।"

গদাধর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন আবার। একটু মৃদু হাসিও ফুটল তাঁর অধরে।

বললেন, "তা বটে—"

"আমার এত বেশী আনন্দ হয়েছে কেন জানেন? পয়সার বদলে উনি যা দিয়েছেন তা সকলে আমরা সমানভাবে ভোগ করেছি। কিন্তু আমাকে একটু ফাও দিয়েছেন—"

"কি রকম?"

"যখন গাড়িতে তুলে দিয়ে বললুম, এখন তাহলে আসি দেবি। তখন কি মিষ্টি করেই যে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে।

ও হাসি আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে চিরকাল—”

গদাধর আবার একটু হেসে বললেন, “চলুন্, যাওয়া যাক। আপনি হেঁটে বাড়ি যাবেন না, চলুন আপনাকে আমি নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।”

